দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি ধনুর নিকটে যাইয়া একবার মহর্ষির দিকে চাহিয়া যেন তাঁহার নীরব অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষিও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই যেন ঈষৎ হাস্যসহকারে হস্তোত্তলন পূর্ব্বক তাঁহাকে নীরব আশীর্ব্বাদ ও অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত করিলেন। তখন মহাবীর রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে সে বিশাল ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে জ্যা যোজনা করিয়া সবলে আকর্ষণ করিলেন। আকর্ষণ মাত্র সেই বজ্রময় সুদৃঢ় ধনুর্দণ্ডখানি মুহূর্ত্তে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। ধনুর্ভঙ্গের মড়মড় শব্দে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। কোদণ্ড ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই "রামজয়" শব্দে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে সমস্বরে শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব্ব বীরত্ব ও অপরিসীম বাহুবলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজিয়া উঠিল; অন্তঃপুরে শুভঘটনাসূচক পুরাঙ্গনাদের হুলুধ্বনি শ্রুত হইল। নিরভিমান বিজয়-উল্লাসে রামের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অনতিবিলম্বে ধনুর্ভঙ্গের আনন্দকোলাহল—রাম-কর্ত্তৃক হরশরাশনে গুণারোপণের শুভ সমাচার অন্তঃপুরে জানকীর নিকট পৌঁছিল। সীতা লোকমুখে লোকাভিরাম রামচন্দ্রের রূপ, গুণ ও অনন্যসাধারণ বীরত্বের অপূর্ব্ব কাহিনী ও অজস্র প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, ঈশ্বর-কৃপায় এরূপ সর্ব্বগুণাধার পতিরত্নলাভের সম্ভাবনা জানিয়া অপরিসীম হর্ষভরে আন্তরিক ভক্তি সহকারে জগৎপতি জগদীশ্বরের পদে শত শত প্রণাম করিয়া আপনার মনে আপনি যারপরনাই প্রীতি অনুভব করিলেন। ধনুর্ভঙ্গ-পণের নিমিত্ত পিতার বিষম দুর্ভাবনায় সীতার প্রাণে যে গভীর বেদনা অনুভব হইতেছিল, এতদিনে তাহার অবসান হইল। এবং যে বীর হরচাপে জ্যা যোজনা করিয়া তাঁহার স্নেহময় পিতা রাজর্ষি জনককে এ গুরুতর চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কি জানি কেন তাঁহার চরণ উদ্দেশে জানকীর মস্তক আপনি আনত হইয়া পড়িল। তিনি মনে মনে চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবৎচরণ স্মরণ করিয়া বলিলেন—"দেব! যে বীরপুরুষ হরধনু ভঙ্গ করিয়া আমার পরম ভক্তিভাজন পিতাকে এক বিষম দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিলেন, আমি যেন তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী হইয়া চিরদিন তাঁহারই পদে প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে আমরণ তাঁহার দাসী হইয়া থাকিতে পারি। তিনিই যেন আমার জীবন-সর্ব্বস্ব ও প্রাণারাম হইয়া একমাত্র চির উপাস্য দেবতার স্থান অধিকার করিয়া থাকেন, তাঁহার পদপূজাই যেন আমার জীবনের মহাব্রত—ধ্রুব লক্ষ্য হয়।

এতদিনে রাজর্ষি জনকের এক বিষম দুশ্চিন্তার অবসান হইল। তিনি ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপারে রামকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া হর্ষভরে তাঁহাকে সস্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতিভরে তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিশ্বামিত্রকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—"তপোধন! বৎস রাম আমার পণসাধন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার

হস্তে প্রাণাধিকা সীতাকে অর্পণ করিয়া আমি প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত হইব। এক্ষণ আমার দ্বিতীয়া কন্যা প্রাণপ্রতিমা উর্ম্মিলাকে সুধী লক্ষ্মণের এবং ভ্রাতা কুশধ্বজের স্নেহের দুহিতা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিকে রাজা দশরথের অপর পুত্রদ্বয়ের করে সম্প্রদান করিতে পারিলে উত্তর কোশলেশ্বরের সহিত আমার বৈবাহিক সম্মিলন যারপরনাই মধুময় হইবে। বিশ্বামিত্র সস্মিত বদনে কহিলেন—"সখে! মঙ্গলময় বিধাতার শুভ নির্ব্বন্ধে আপনার শুভ অভিপ্রায় অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কেন না বিধাতা স্বজনের অভিলাষ অপূর্ণ রাখেন না। আপনি ত্বরায় অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করিয়া মহাত্মা দশরথকে এখানে আনয়ন করুন। তিনি এখানে আসিলেই এ সম্বন্ধে সকল কথার মীমাংসা হইবে। অনন্তর বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকের কুলপুরোহিত শতানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎস! তুমিই দূত; তুমি এ দৌত্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করিয়া আমার আশীর্ব্বাদ ও রাজর্ষির সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করতঃ রাজা দশরথকে এদিকের সকল কথা বুঝাইয়া বলিবে। তুমিত সকলই জান, তোমাকে আর এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিব? যে কথা যেমন করিয়া বলিলে ভাল হয়, তুমি অবশ্যই সে কথা তেমনি করিয়াই বুঝাইয়া বলিতে পারিবে। জনকের সাগ্রহ-সম্মতি ও বিশ্বামিত্রের স্নেহাদেশ পাইয়া পুরোহিত শতানন্দ অবিলম্বে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাকালে কুলগুরু বশিষ্ঠ, পুরোহিত বামদেব, স্নেহাস্পদ পুত্র ভরত-শত্রুঘ্ন, বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন ও কতিপয় অমাত্য অনুচরগণ সমভিব্যাহারে রাজাধিরাজ দশরথ মিথিলা নগরে—জনক-ভবনে উপনীত হইলেন। রাজর্ষি জনক সবান্ধবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সমুচিত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে স্বভবনে লইয়া গেলেন। দীর্ঘকাল অন্তে প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের দর্শনে রাজা দশরথের চিন্তাকুল-চিত্তে পরমা শান্তির সঞ্চার হইল। বহুদিন পরে পরম ভক্তিভাজন পিতৃদেবের দর্শনলাভ করিয়া পিতৃ-ভক্ত রাম-লক্ষ্মণ হর্ষভরে আন্তরিক ভক্তিসহকারে তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। রাজা পুত্রদ্বয়কে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া সস্নেহে উভয়ের মস্তকাঘ্রাণ করিতে করিতে তাঁহাদের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন রামের, লক্ষ্মণ ভরতের, ও শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণের চরণ বন্দনা করিয়া পরস্পর প্রণয়-গর্ভ শিষ্টালাপে মগ্ন হইলেন।

অনন্তর মহাত্মা জনক কোশলেশ্বরের সহিত নানারূপ শিষ্টালাপ সম্পন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মধুর বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা দশরথও প্রীতি-প্রফুল্ল মনে মধুর বচনে রাজর্ষির শুভ প্রস্তাবে সসম্ভ্রম সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অনতিবিলম্বে সমাগত ঋষি-মণ্ডলী সম্মিলিত হইয়া শুভ বিবাহের শুভ দিন ও শুভ লগ্ন স্থির করিলেন। চতুর্দ্দিকে পরিণয়োৎসবের প্রথম মাঙ্গলিক ধ্বনি সূচিত হইল।

মহা-ঐশ্বর্য্যশালী রাজা জনক তনয়াগণের বিবাহের জন্য অচিরে এক সুবৃহৎ সুশোভন সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। সভা-গৃহের মণিময় স্তম্ভ,

সুবর্ণ-মাণিক্য খচিত বিবিধ সাজসজ্জা ও চারু-চিত্রে সে সুবিস্তৃর্ণ গৃহখানি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নগরময় প্রতি রাজপথে ও প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রতি গৃহদ্বারে রম্ভাতরু, মঙ্গলঘট ও বিচিত্র পতাকাবলী প্রভৃতি মাঙ্গলিক চিহ্ন সকল ভূতলে অমরাবতীর শোভাবিস্তার করিল। ক্রমে নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ এবং পরাজিত ও শরণাগত রাজাসকল বহুমূল্য প্রীতি-উপহারসহ জনকভবনে উপনীত হইলেন। সমাগত আত্মীয়-স্বজন তৎ-সমভিব্যাহারী অনুচরগণ ও হয়-হস্তীর পদভরে মিথিলাভবন যেন টলমল করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অল্পকাল মধ্যে বিরাট উৎসবের জনকোলাহলে বিদেহনগর পরিপূর্ণ হইল। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও আনন্দ-কোলাহলে নগরখানি যেন উৎসবময় হইয়া উঠিল।

নির্দ্ধারিত দিবসে যথানির্দ্দিষ্টকালে সাম্বজ-জনক শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থ সভাস্থ সভ্যগণের অনুমতি গ্রহণান্তর কৌলিক প্রথানুযায়ী রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন প্রভৃতির করে যথাক্রমে সীতা, মাণ্ডবী, উর্ম্মিলা ও শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতিকে সম্প্রদান করিলেন। নবদম্পতিগণের অনুরূপ সমাগমে বিবাহ-সভা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। উৎসবের গীত, বাদ্য, হুলুধ্বনি ও সমাগত জন-গণের আনন্দ কোলাহলে সভাস্থল মুখরিত হইল। স্তুতিপাঠক ব্রাহ্মণ ও ভট্টগণ পরিণযোৎসব উপ-যোগী মাঙ্গলিক গাথার সহিত রাজা দশরথ ও রাজর্ষি-জনকের গুণাবলী এবং বংশ বিবরণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তনয়াদিগের শুভ উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে রাজর্ষি জনক অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, বধির, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা প্রভৃতি অর্থী ও প্রার্থীদিগকে উপাদেয় মিষ্টান্ন এবং যথাযোগ্য অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। দরিদ্রেরা প্রার্থনাতিরিক্ত দান লাভে হর্ষভরে নবদম্পতী-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এইরূপে মহা আড়ম্বরে রাম-সীতা প্রভৃতির শুভ পরিণয়ের মাঙ্গলিক উৎসব সুসম্পন্ন হইল।

ক্রমে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ ও আত্মীয়-স্বজনবর্গ স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে লাগিলেন। যথাকালে রাজা দশরথ বৈবাহিকের নিকট পুত্র-পুত্রবধূগণ-সহ অযোধ্যা গমনের প্রস্তাব করিলেন। সমাজ ও কুল-প্রথাভিজ্ঞ জনকও কিছুমাত্র আপত্তি প্রদর্শন না করিয়া বৈবাহিকের সুসঙ্গত প্রস্তাবে সহর্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নবপরিণিতা কন্যা-গণের প্রথম শ্বশুর ভবনে গমনোপযোগী যথা-বিহিত আয়োজন করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসের নির্দ্ধারিত সময়ে রাজা দশরথ স্নেহাস্পদ পুত্র-পুত্রবধূগণ সহ প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

"দশরথ চলিলেন আপনার ঘর।
হেথা রাজা বিদায় করেন কন্যাবর॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেয় বদন কমলে।
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমারে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ॥
শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ দ্বেষ অসূয়া না কর কার প্রতি॥
সুখ দুঃখ না ভাবিও যা থাকে কপালে।
স্বামী সেবা না ছাড়িও কোন কালে॥

(কীর্ত্তিবাস)

স্নেহময় জনক এইরূপ অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া কন্যাদিগকে স্বামি-গৃহে পাঠাইলেন।

জানকী নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে প্রথম স্বামী-ভবনে উপনীত হইতে পারেন নাই। মহাবীর পরশুরাম কর্ত্তৃক তাঁহাদের পথ অবরুদ্ধ হইল। ভার্গব ত্রিপুরান্তকারী দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় শিষ্য—মহাশৈব। শ্রীরামচন্দ্র হর-ধনু ভগ্ন করায় তিনি বীরকুল-চূড়ামণি রামচন্দ্রের প্রতি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনজেতা জামদগ্ন্য স্বীয় গুরুর অবমাননার প্রতিশোধ শিবধনু ভঙ্গের প্রতিফল প্রদান মানসে বীরকুল-ধুরন্ধর শ্রীরামচন্দ্রের গতিপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

সীতা চন্দ্রবংশোদ্ভবা ক্ষত্রিয় রাজ দুহিতা এবং সূর্য্যবংশোদ্ভূত মহাবীর মহাত্মা রামচন্দ্রের বণিতা যুদ্ধের নামে ক্ষত্রিয় রাজকন্যা—ক্ষত্রিয় স্ত্রী ভয়ে মূর্চ্ছিতা না হইলেও, যে বীর একবিংশতিবার ধরিত্রীকে নিঃক্ষত্রিয়া * করিয়াছেন, যিনি দশানন বিজয়ী বীরকুলরত্ন হৈহয়পতিকে সংহার করিয়া জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন, সেই মাতৃহন্তা নিষ্ঠুর বীর পরশুরামের ভীম আক্রমণে নবপরিণিতা বালিকা ক্ষত্রিয় কন্যা সীতার কোমল প্রাণে দুশ্চিন্তার ক্ষীণ রেখা-সম্পাত অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং অতর্কিত অভিনব বিপৎপাতে চিন্তা-ভাবনায় নববধূ জানকীর বদন কমল ম্লানভাব ধারণ করিল। সতী পতির মঙ্গল কামনায় মনে মনে জগৎ পতির নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সতীর কাতর প্রার্থনা জগৎ পতির পদে পৌছিল। মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় মহাবীর রামচন্দ্র ভার্গবশরাসনে জ্যা যোজনা করিতে সমর্থ হওয়ায় পরাজিত বীর ত্রিভুবন বিজয়ী পরশুরাম হীনবীর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া লজ্জাবনত মুখে মহেন্দ্রাচলে প্রস্থান করিলেন। পতির ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় ম্লানমুখী সীতা আবার হর্ষোৎফুল্ল বদনে রথারোহণে স্বামীসহ স্বামী-ভবনে গমন করিলেন।

ক্রমে রথ সমূহ অযোধ্যার রাজনিকেতনে—দশরথ রাজভবনের দ্বারদেশে উপনীত হইল। রাজকুমারেরা বধূগণ সহ রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন পৌরজনেরা মঙ্গল-সূচক আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন। কৌলিক রীত্যানুযায়ী নব-পরিণিত দম্পতীগণের তৎকালোচিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন হইলে তাঁহারা একে একে কৌশল্যাদি রাজমহিষীগণের ও অন্যান্য গুরুজন-বর্গের চরণে অভিবাদন করিলেন। মহারাজ্ঞীরা পুত্র-পুত্রবধূদিগকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রীতি-প্রফুল্লবদনে বধূদিগকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া হর্ষভরে বারংবার তাঁহাদের অনুপম রূপ-লাবণ্য দর্শন ও শ্রীমুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

* পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-শোণিতে পিতৃতর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধাগ্নির নির্ব্বাণ ও আত্মতৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারেন; কিন্তু একবিংশতিবার ধরিত্রীকে নিঃক্ষত্রিয় করিলেন কেমন করিয়া? ধরিত্রীদেবী একবার ক্ষত্রিয় শূন্য হইলে, অতঃপর বিংশতিবার হত্যা করিবার জন্য তিনি ক্ষত্রিয় প্রাপ্ত হইলেন কোথায়? এবং তিনি পুনঃ পুনঃ ধরিত্রীকে নিঃক্ষত্রিয় করা সত্ত্বেও রাজা দশরথ ও রাজর্ষি জনক প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণ কেমন করিয়া জীবিত থাকিলেন? সুতরাং পরশুরাম কর্ত্তৃক একবিংশতিবার ধরিত্রী নিঃক্ষত্রিয় হইবার কথাটা রূপক কল্পনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?' ক্রোধান্ধ জামদগ্ন্য পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য পুনঃ পুনঃ বহু ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই কল্পিত কথার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

ক্রমে রীত্যানুযায়ী শুভ পরিণয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সকল সুসম্পন্ন হইলে অন্তঃপুরে মহিলা-গণ নববধূদিগকে লইয়া নিত্য নূতন উৎসবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা সীতা ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী ও বিশ্বস্তা সখীর ন্যায় হিতৈষিণী হইয়া দেববালার ন্যায় পতির হৃদয় মন অধিকার করিয়া লইলেন। ফলতঃ মনোমুগ্ধ-কারিণী সীতার অনুপম মধুর ব্যবহারে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার প্রতি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনুরূপ সমাগমে দম্পতীর প্রাণে বিমল দাম্পত্য প্রেমের অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল।

নববধূর মধুর ব্যবহারে শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন এবং অন্যান্য পুরবাসী-পুরবাসিনী ও অন্তঃপুর ললনাগণ সকলেই সীতার প্রতি যারপর নাই প্রীত হইলেন। গুণগ্রাহী দেবর ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া সীতাকে জননীর ন্যায় ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং সীতাও দেবর ও দেবরপত্নীদিগকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায়ই ভালবাসা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সীতা রাজকন্যা ও রাজকুলবধূ হইয়াও নিয়ত গুরুজনের সেবা-পরিচর্য্যায় সময়পাত করিতে বড় ভালবাসিতেন। দেবার্চ্চনা ও ব্রতনিয়মানুষ্ঠান ভক্তিমতী কৌশল্যা ঠাকুরাণীর পরম তৃপ্তিপ্রদ নিত্য-কার্য্য ছিল। রাজলক্ষ্মী সীতা ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা শ্বশ্রূর পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার দেবপূজার উপাদান-উপকরণ সমূহ—পুষ্প বিল্বদল, তুলসী দূর্ব্বা ও অগুরু চন্দনাদি যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া রাখিতে, নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে, ধূপ দীপাদি জ্বালিয়া দিতে এবং স্বহস্তে স্বর্ণ কলসী ভরিয়া দেবপূজার জন্য সুনির্ম্মল জল তুলিয়া তাহা কর্পূরাদি সংযোগে সুবাসিত করিয়া রাখিতে বড় ভালবাসিতেন। পবিত্র দেব কার্য্যে দাসদাসী কি অপরের সহায়তা গ্রহণ বিশুদ্ধ ভক্তির পরিচায়ক নহে। সুতরাং ভক্তি-মতী ও নিষ্ঠাবতী কৌশল্যা দেবী প্রাণাধিকা পুত্রবধূর এরূপ সাহায্য লাভে অন্তরে পরম প্রীতি অনুভব করিতেন। ফলতঃ সীতার অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও অমিয় মধুর ব্যবহারে অযোধ্যার রাজসংসার প্রকৃতই সুখের সংসার—স্বর্গীয় শান্তিনিকেতন হইল।

ক্রমশঃ—

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত সেন বর্ম্ম কবিরত্ন।

---

## কৃষকের দুর্দ্দশা।

দুর্ভিক্ষ করাল বদন ব্যাদান করিয়া হতভাগ্য বঙ্গবাসীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ওদিকে পূর্ব্ববঙ্গে শত শত নর নারী অনশনে হাহাকার রবে দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইয়া জঠর জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে—এদিকে পশ্চিমবঙ্গেও দুর্ভিক্ষের ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এ দুর্দ্দিনে যাহাদের দু'পয়সা আছে, তাহাদের দিন এক রকম চলিয়া যাইবে। এখন ভাবিবার কথা—ঐ হতভাগাদের, যাহারা দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ, যাহারা দেশের শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে, যাহারা না থাকিলে দেশের "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" ভূমি অনুর্ব্বর মরুপ্রান্তরে পরিণত হইয়া যাইবে। দুর্ভিক্ষের প্রবলতম ঘাত সর্ব্ব-প্রথমে কৃষকের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হয়, আর

ইহার প্রতিঘাত ক্রমে ক্রমে উচ্চতর শ্রেণীতে পৌঁছাইয়া থাকে। তাই বলি, যদি এ সময় দেশের লোকের প্রধান কোন বিষয় ভাবিবার থাকে, তাহা হইলে তাহা ঐ বঙ্গের কৃষকের দুর্দ্দশার কথা।

আমাদের দেশের কৃষকের কথা বলিতে হইলে, তিনটী বিষয়ের আলোচনা বিশেষ আবশ্যক, যথা—(১) ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রণালী, (২) শস্যোৎপাদন, (৩) শস্য-রক্ষা।

## (১) ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রণালী।

বৎসর বৎসর জমীতে শস্য উৎপন্ন হইলে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এজন্য প্রতি বৎসর জমীতে উপযুক্ত সময়ে সার দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকেরা অধিকাংশ স্থলে কোন প্রকার সার ব্যবহার করে না, প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিজের ভাগ্যের দোহাই দিয়া চাষ করিতে বড় ভালবাসে। সুপ্ত সিংহের মুখে কখনও মৃগ স্বয়ং আসিয়া প্রবেশ করে না, এ সত্যবাণী কে তাহাদের মর্ম্মস্থলে পৌঁছাইয়া দেয়? দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ কৃষক এইরূপ ভাবাপন্ন। ইহার বিশেষ কারণও আছে, পূর্ব্বে দক্ষিণ বঙ্গ প্রায়ই বন্যায় ডুবিয়া যাইত, ইহার কিয়দংশ "বুড়ানিয়ার দেশ" নামে খ্যাত ছিল। যে দেশ বন্যায় ডুবিয়া যায়, সে দেশের জমীতে পলী পড়িয়া জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই রূপে প্রকৃতির প্রভাবে এবং বিনা আয়াসে জমীর উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হইত বলিয়া জমীতে সার দিবার প্রণালী অনেক কৃষক আজ পর্য্যন্তও অবগত নহে। কিন্তু দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় বৎসর বৎসর বন্যার প্রকোপ দেখা যায় না। অনেক স্থানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাল খনিত হইয়া জল নিকাশের ব্যবস্থাও হইয়াছে, এখন আর জমী বন্যার জলে বড় একটা ডুবিয়া থাকে না। বন্যার জলে পলী পড়িয়া জমী উর্ব্বর হইবে বলিয়া এখন আর কৃষকদের বসিয়া থাকা চলে না। বঙ্গের স্থানে স্থানে যে সকল কৃষক জমীতে সার দিবার প্রণালী অবগত আছে এবং তদনুসারে সার দিয়া থাকে, তাহাদেরও প্রণালী আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিধান অনুসারে পরিশোধিত হওয়া আবশ্যক। একথা সকল কৃষকেরই মনে রাখা আবশ্যক যে, তাহাদের প্রতিযোগিতা পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর বঙ্গদেশ মধ্যেই আবদ্ধ নহে, তাহাদিগকে এখন বঙ্গের বাহিরের—কেবল বঙ্গের বাহিরেরই বা বলি কেন, ভারতেরও বাহিরের অনেক দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। রেঙ্গুন, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশ হইতে হাজার হাজার মণ ধান্য ও চাউল প্রতি বৎসর এই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার বঙ্গ দেশে আমদানি হইয়া থাকে; বঙ্গের কৃষককে সে কথা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছে কি? হায়, দেশের অবস্থা! দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শস্য উৎপাদিকা শক্তি কোথায় গেল? যদি তাহা ফিরিয়া পাইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমাদের দেশের কৃষকগণ যাহাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে, তাহার ব্যবস্থা অগ্রে করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান কালে কৃষিকার্য্যের জন্য অনেক প্রকার নূতন নূতন যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার দ্বারা কৃষিকার্য্যের অনেক ব্যয় হ্রাস হইতে পারে। অল্প ব্যয়ে অধিক শস্য উৎপাদনের দিকে কৃষকের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালার মাটির এমনই গুণ যে, লোকে নূতনকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। ফলে, বঙ্গের কৃষকেরা ক্ষেত্র প্রস্তত সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের কৃষক অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে; তাহাদিগকে অগ্রবর্ত্তী করিবার জন্য দেশের উচ্চতর শ্রেণীর লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

## (২) শস্যোৎপাদন।

শস্য দুই প্রকারের আছে, খাদ্যশস্য ও উপ-করণ শস্য। খাদ্যশস্য, যথা—ধান্য, কড়াই, আলু পটল ইত্যাদি; আর বঙ্গের উপকরণ শস্যের মধ্যে পাটই এখন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাদ্য-শস্যের দ্বারা দেশের শস্য-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, লোকের অন্ন-সংস্থান হয়, উপকরণ শস্যের দ্বারা অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খাদ্যশস্যের দ্বারা দেশের লোকের যেরূপ উপকার হয়, উপকরণ শস্যের দ্বারা সেরূপ হয় না। দেশে যদি খাদ্য শস্য অধিক পরিমাণে জন্মায় তাহা হইলে তাহার দরও কমিয়া যাইতে পারে এবং তদ্দারা সমগ্র দেশবাসী উপকৃত হইয়া থাকে। আজ বঙ্গের উপকরণ শস্য পাট, অনেক জায়গায় ধান চাষের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, সমগ্র ভারতে যে সব জমীতে পাট উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র বঙ্গ-দেশেই শতকরা ৮৭.১ পরিমাণ জমীতে পাট হইয়া থাকে। পাটচাষে দেশের যে কতদূর অপকার হইতেছে, তাহা আজ পূর্ব্ব বঙ্গবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিতেছে, আজ খাদ্যশস্যের অভাবে পূর্ব্ববঙ্গের নর-নারী দুর্ভিক্ষ কবলে নিষ্পেষিত হইতেছে। পাটচাষ করিয়া টাকা পাইবে, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া কৃষক তাহার অধিকাংশ জমী পাটক্ষেতে পরিণত করিয়াছে, কিন্তু সে টাকায় কিনিবে কি? দেশে যে আর সেরূপ ধান হয় না, পাট বিক্রয়ের টাকায় চতুর্গুণ মূল্যে তোমায় ধান কিনিতে হইবে; ফলে পাট চাষে—উপকরণ শস্য উৎপাদনে যে দেশের দুর্দ্দশা অনিবার্য্য তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ব্বে যেমন নীলে কৃষকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, এখন আবার পাটে সেই সর্ব্বনাশ আনয়ন করিতেছে। পদে পদে বিপদগ্রস্থ হইয়াও কি কৃষকেরা দেশের মঙ্গল—আপনাদের মঙ্গলের কথা ভাবিতে শিখিবে না? গল্পে আছে, পুরাকালে মাইডাস নামে এক নরপতি ছিলেন; তাঁহার ধনতৃষ্ণা অতিশয় প্রবল ছিল। এজন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রায়ই প্রার্থনা করিতেন। একদিন ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও? তদুত্তরে হর্ষগদগদ-স্বরে রাজা বলিলেন, আমাকে এই বর দিন যেন আমার স্পৃষ্ট সকল জিনিসই সুবর্ণে পরিণত হয়। স্বয়ং ভগবান্ তদনুসারে তথাস্তু বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ গৃহের সমস্ত দ্রব্য স্পর্শ করিতে লাগিলেন, সমস্ত সুবর্ণে পরিণত হইল। খাইবার সময় খাদ্যদ্রব্য হাতে তুলিতে গিয়া দেখেন, তাহাও সোনা হইয়া গেল, সুতরাং

খাইতে পারিলেন না. এইরূপে রাজা মহা বিপদে পড়িলেন. অনশনে দিন কাটাইতে হইল। অবশেষে পুনরায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। আমাদের দেশের কৃষকেরও সেই অবস্থা; তাহারা তাহাদের উৎপন্ন শস্য রৌপ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে নিত্য ঘোর অনশনব্রত আনয়ন করিয়াছে।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই চাষ দেশের মহা অনিষ্ট করিতেছে। খাল, বিল, নদী প্রভৃতিতে চাষারা পাট পচাইয়া দেশের জল বায়ু দূষিত করিয়া ফেলিতেছে। ইহার দ্বারা রোগবীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া শত শত লোককে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত করিতেছে। স্বাস্থ্যহানি ত ঘটিতেছে, প্রাণহানিরও অভাব নাই। যে সকল কৃষক পাট চাষে লিপ্ত থাকে, তাহারাও স্বকৃত দোষের ফলভোগী যে না হইয়া থাকে,তাহাও নয়। প্রায় সমস্ত দিন দূষিত জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া পাট কাচিয়া এরূপ ক্ষত প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে যে, তাহাদিগকে তজ্জন্য বহুদিন ভুগিতে হয়, কোন কোন স্থলে বা ইহলীলা সংবরণ করিতে হয়। দেশের লোকের এত অনিষ্ট করিয়া, নিজেদের অমঙ্গল নিজেরা ডাকিয়া আনিয়াও যে দেশের কৃষকের চক্ষু উন্মিলীত হয় না, সে দেশের মঙ্গল যে কিসে হইবে কে জানে? এই এ দেশেরই পণ্ডিত চাণক্যের পদতলে কুশ ফুটিয়াছিল বলিয়া তিনি দশ ক্রোশব্যাপী স্থানে ঘোল ঢালিয়া তাহা নষ্ট করিয়াছিলেন, আর সেই দেশেরই লোক আমরা, পাটের চাষে আমাদের দেশের লোক ধানের মুখ দেখিতে পাইতেছে না, অনাহারে মারা যাইতেছে, আমরা তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছি না! তাই বলি, এখন উপকরণ-শস্য অপেক্ষা খাদ্য শস্য উৎপাদন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

৩—শস্য-রক্ষা।

বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা যদি পূর্ব্বের ন্যায় দেশেই আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে কৃষকদের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। এখন অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে দেশের শস্য দেশ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইতেছে, অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালীর অন্ন দেশ দেশান্তে গিয়া পড়িতেছে, আর আমরা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছি। কালপ্রভাবে এই অবাধ-বাণিজ্যের স্রোত বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাসে বঙ্গের বহির্বাণিজ্যের মধ্যে তণ্ডুল রপ্তানির নিদর্শন যে না পাওয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু এরূপ বিপুল রপ্তানি বঙ্গদেশে কস্মিন্‌কালে পরিলক্ষিত হয় নাই। এই বহির্বাণিজ্যের স্রোত কে রোধ করিতে পারে? বৈদেশিক বাণিজ্য এখন এরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে যে, কি রাজশক্তি, কি প্রজাশক্তি কিছুই ইহাকে সহজে ব্যাহত করিতে সমর্থ হইবে না।

তবে শস্য-রক্ষা সম্বন্ধে কৃষকেরা স্বয়ং চেষ্টা করিলে তাহাদের দুর্দ্দশার লাঘব হইতে পারে। এক শ্রেণীর লোকের ধারণা আছে যে, দেশের লোকের এ বিষয়ে কিছু হাত নাই। কিন্তু যাহারা নিজেদের সাহায্য নিজেরা করিয়া থাকেন, ঈশ্বর তাহাদের সহায় হয়েন। শস্য-রক্ষা বিষয়ে

আমাদের কৃষকেরা সম্পূর্ণ উদাসীন। সাধারণতঃ শস্য ঝাড়াই হইয়া যাইলে কৃষকেরা তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলে, দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কথা তাহাদের মনে উদয় হয় না। আর যে সময় তাহারা বিক্রয় করে, সে সময় শস্যের দর খুব সুবিধা থাকে, পরে আবার তাহাদিগকে দেড়গুণ, দ্বিগুণ মূল্যে ধান্য খরিদ করিয়া অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হয়। সে সময় তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। অনেকে দাদন লইয়া, মহাজনের নিকট অধিক হারে সুদ গ্রহণ করিয়া *নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে। এ সকল* বিষয়ে আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। তাহা না হইলে, বঙ্গের নিরন্ন কৃষককুলের দীর্ঘ নিশ্বাসে শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে। দেশের শস্য যাহাতে দেশ হইতে বাহির হইয়া না যায়, কৃষকের কঠোর শ্রমলব্ধ অন্ন যাহাতে তাহারই উদরপূর্ত্তি করিতে সমর্থ হয়, তাহার একটা দেশব্যাপী ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বঙ্গের কৃষকের দুর্দ্দশার বিষয় বিষম সমস্যার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু যতদূর সম্ভব তাহার সমাধান করা চাই।

## প্রতিকার।

কৃষকদের দুর্দ্দশা অপনোদন করিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটী জিনিসের আবশ্যক—(ক) অর্থ সাহায্য (খ) কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা।

### (ক) অর্থ-সাহায্য।

নানা বিষয়ের জন্য কৃষকদিগকে অর্থ-সাহায্য করা প্রয়োজন। জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সার ক্রয় করিতে, ভাল বীজ কিনিবার জন্য, আবাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রথমতঃ কৃষকদিগকে এই সকল বিষয়ে সাহায্য করা চাই। মূল্যবান কৃষি-যন্ত্রাদি পরে ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলেও চলিতে পারে। এখন কৃষকদের দিন চলাই ভার হইয়াছে, সুতরাং বাহির হইতে অর্থ-সাহায্য ভিন্ন তাহারা দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না। এজন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং ধনীবৃন্দের সমবেত চেষ্টা থাকা চাই। অনেক স্থলে গভর্ণমেণ্টও কৃষকদিগকে এই সকল বিষয়ে *সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে অল্প হার সুদে ঋণদানের* ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের লোকও কি ঐ প্রকার সদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এই প্রকার ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়া শত শত কৃষকের প্রাণ বাঁচাইতে পারেন না? অবশ্য, ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা এরূপ বৃহৎ কাজ সম্পাদন অনেক স্থলে সম্ভব হইতে পারে না; কিন্তু দেশের যাহারা মাথা, যাহাদের দু-পয়সা আছে, তাহারা যদি সমবেত হইয়া প্রত্যেক গ্রামে যৌথ-ঋণদান-সমবায় প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে দরিদ্র কৃষককুল ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, অথচ তাঁহাদের অর্থেরও সদ্ব্যবহার হয়। কত লোকের কত ধনরাশি অলসভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাঁহারা যদি এরূপ ভাবে তাহা খাটাইয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে নিজের উপকার ত হয় বটেই, তদ্ব্যতীত অনেক অভাগার চোখের জল চিরকালের তরে শুকাইয়া যায়। দেশের লোক দেশের অভাগাদের জন্য যদি এ ব্যবস্থা না করিবে ত, করিবে কে? ইহার জন্য দেশময় ঘোর

আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। সুখের বিষয়,বঙ্গের স্থানে স্থানে ইতিপূর্ব্বেই এইরূপ কতকগুলি ঋণ-দান-সমবায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষকদের সাহায্যার্থ প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে এইরূপ ঋণ-দান-সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে।

ঋণদান-সমবায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের উন্নতি কল্পে কতকগুলি নিয়ম গঠিত হওয়া আবশ্যক। কৃষকেরা যাহাতে স্ব স্ব জমীতে অন্য কিছু ফসল না করিয়া কেবলমাত্র খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে, অন্য কোন মহাজনের নিকট হইতে দাদন বা ঋণ গ্রহণ না করে, উৎপাদিত শস্য রপ্তানি সম্বন্ধে সংযত হয়, প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ঐ সকল ঋণদানের সর্ত্ত থাকা আবশ্যক।

## (খ) কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা।

কৃষককে শিক্ষা দিবার কথা আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। এ দেশে 'চাষা' বলিলে মূর্খ লোককেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে চাষারা ঘৃণার্হ নহে,এবং অন্য সকল বিদ্যার ন্যায় স্কুল কলেজে গিয়া তাহাদিগকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। আমাদের কৃষকদিগকেও এখন কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দিবার কাল আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা না হইলে পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষে আমাদের কৃষককুল নির্ম্মূল হইবার আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে। আমাদের গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় খুলিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এখনও কার্য্য করিবার অনেক আছে। যাহাদের উপকারার্থ এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা এখনও ইহার ফলভোগী হইতে পারিতেছে না। দারিদ্র্য বশতঃ কৃষকদের এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ ঘটিতেছে না; তবে যদি দেশের যুবকেরা এই সকল বিদ্যালয় হইতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়া গ্রামে গ্রামে কৃষকদের শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সুফল হইতে পারে।

শিক্ষা দুই প্রকারে দিতে হইবে; প্রথমতঃ, কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে কৃষি সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহিত বক্তৃতাদি হইবার ব্যবস্থা থাকা চাই। এইরূপ বিদ্যালয় সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময় হইতে বসান উচিত; কৃষকেরা সমস্ত দিন খাটিয়া আসিবার পর এই বিদ্যালয়ে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবার সম্বন্ধে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিবে না। অপরন্তু, যদি এই সকল বিদ্যালয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির দ্বারা আলোচ্য বিষয়টি চিত্তাকর্ষক করা যায়,তাহা হইলে কৃষকেরা আনন্দের সহিত এই স্থানে প্রত্যহ উপস্থিত হইবে এবং কৃষি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক কৃষিবিদ্যালয়ের সহিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র থাকা আবশ্যক। কি প্রকারে সার প্রস্তুত করিতে হয়, কি প্রকারে উহা জমীর সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ কৃষিযন্ত্র কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ ফসলের কি প্রকারের পাট করিতে হয় প্রভৃতি সমুদয় কৃষি-কার্য্য কৃষকদিগকে চাক্ষুষ দেখাইয়া না দিলে, তাহারা এই সকল বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ এইরূপ আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট ফসল সকল দেখিয়াও কৃষকেরা

সেইরূপ ফসল তাহাদের স্ব স্ব কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারে।

কৃষি-বিদ্যালযের সহিত কৃষি প্রদর্শনীও থাকা চাই। এইরূপ প্রদর্শনীতে নানা দেশের কৃষি-যন্ত্রাদি, নানা প্রকারের সার,বীজ, নানা প্রকারের ফসল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। মোট কথা, কৃষকেরা যাহাতে সহজে ও আনন্দের সহিত কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রযোজন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম।

---

# দেবপুর ইতিহাস।

## বলহরি সর্দ্দার।

কমতা বিহার বা কুচবিহার রাজ্যান্তর্গত, মহকুমা মাথাভাঙ্গার অন্তঃপাতি, বাঘমারা-সুকান দীঘি গ্রামের পূর্ব্বদিকে এবং কুমারীর কোটের পশ্চিমে একটি সুবিস্তৃত জনশূন্য ভূভাগ পতিত আছে। ঐ স্থান আজকাল, কেশে, নল, খাগড়া, কুল, ঝাঁউ ও বন্যবৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। ঐ স্থানে যে সমস্ত ধান্যাদির ক্ষেত্র আছে, তাহার আকার দেখিলে বোধ হয়,পূর্ব্বে কোন বেগবান্ নদী কর্ত্তৃক উহা ভগ্ন হইয়া, পয়স্তীরূপে পরিণত হয় এবং পরে তাহা কাল-ক্রমে বন্যবৃক্ষাবলী ও ধান্য ক্ষেত্রাদিতে পরিণত হইয়াছে।

দুইশত শতাব্দীর পূর্ব্বে ঐ ভূভাগের নাম মহাদেবপুর ছিল। এই পুর সাধারণতঃ চারি-ভাগে বিভক্ত থাকিয়া, তত্রস্থ অধিবাসিগণের সুবিধা বিস্তার করিত। ইহার পূর্ব্বভাগ হরি-পুর, মধুপুর এবং কুমারীর কোট; দক্ষিণদিকে চন্দনকোট—ডেকা রাজার বাড়ী; পশ্চিমদিক সিন্দুরকোট নামে সুপরিচিত, আর উত্তরদিক চতুর্থ খণ্ড—ইহা চিলা রায কোট বা চেল্লার পাথার নামে পরিচিত। এ স্থানে মহারাজ নলের পাটবাড়ী আছে।

মহাদেবপুরের যে স্থানে বন্দর অবস্থিত ছিল ঐ স্থান "সুকানদীঘি-বাঘমারা" নামে আজকাল অভিহিত হইতেছে। হিমালয় বিনিসৃত বেগবতী তরসানদীর পশ্চিম উপ-কূলে, এই গণ্ডগ্রাম ভগ্ন মস্তকে অবস্থান করি-তেছে। তরসানদীর জল-প্লাবনে ঐ ভূভাগ খণ্ড বিখণ্ড হইযা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে বড়বাড়ী, বাঘমারা, সুকানদীঘি, মহাদেবগঞ্জ, সর্দ্দারের ডাঙ্গা, বালিয়ামারী, কুমারীর কোট, যোগীর ভিটা প্রভৃতি নামগুলি বিখ্যাত হইযা পড়িযাছে। বড়বাড়ীর বিখণ্ড গুলির মধ্যে অধুনা যেগুলি কৃষি-উপযোগী সে গুলি "দাবিডী," এবং যেগুলি দ্বীপাকারে ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ সেগুলি "কুঠী" নামে অভিহিত। দাবিডীর ভূমিতে তরসানদীর বন্যা সংযোগ হইলে পঙ্ক-রাশি বিস্তীর্ণ হয়। তদ্দ্বারা ধান্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল ফসল উৎপন্ন হইয়া,কৃষি-জীবিগণের সুখস্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন এবং উত্তমর্ণাদির ঋণ পরিশোধ হইয়া থাকে। আর যেগুলি কুঠী তদ্দ্বারা গৃহপালিত গো, মহিষাদি পশুগণের খাদ্যোপযোগী তৃণ উৎপন্ন হয়। এস্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব [illegible] কারণ সন্নিকটে স্বর্ণ শৈল [illegible]

প্রবাহিত। স্থানটী স্বাস্থ্যের উপযোগী। এখানে একটী বৃহৎ প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্নাবশিষ্টাংশের পরিপাট্য অতি মনোহর। এই দৃশ্য অবলোকন করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, প্রাচীন সময়ে এই বাড়ী কোন একজন ধনাঢ্য বা প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ী ছিল।

আমরা প্রাচীন মনীষিগণের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছিলাম, শতাধিক বর্ষ অতীত হইল, এই মহাদেবপুর গ্রামে "বলরাম প্রকাশ" নামে বলহরি সর্দ্দারের এক বড় বাড়ী ছিল।

দুইশত শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ মহাদেবপুর একটী সমৃদ্ধিশালী পল্লী ছিল। বলহরি সর্দ্দার একজন প্রবল প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি জাতিতে পৌণ্ড্রক ক্ষত্রিয়। বঙ্গাব্দ ১১৯০ সালে তাঁহার জন্ম। তাঁহারা দুই ভাই, ইনি কনিষ্ঠ, গৌরহরি সর্দ্দার জ্যেষ্ঠ ছিল। ইহাদের পিতার নাম বুদ্ধিনারায়ন সর্দ্দার। তাঁহাদের "সর্দ্দার" উপাধি ঊর্দ্ধ-বংশানুক্রমিক।

আমি যে কালের কথা বলিতেছি,সেই সময় শিববংশোদ্ভব মহারাজ নর-নারায়ণ স্থাপিত মহাদেব পুরের "নারায়ণ বন্দর" তরসানদী কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নারায়ণ নাম আর মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। তাঁহার অতীত কালের স্মৃতি-স্বরূপ "নারায়ণ" দীর্ঘিকা, এখনও নর-নারায়ণ মহারাজার কীর্ত্তিকলাপের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

তরসা নদীর পশ্চিম উপকূলে স্বর্গীয় মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ স্থাপিত সুকানদীঘি-বন্দর। এই সুকানদীঘি সংস্কার প্রবাদ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ স্থাপিত সুকানদীঘি বন্দরের অদূরে অগ্নিকোণে বলহরি সর্দ্দারের পিতা বুদ্ধি নারায়ণের প্রাগুক্ত বিচিত্র বাড়ী। এই কালে বলহরি সর্দ্দারের বড়বাড়ীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে তরসা নদী. পশ্চিম প্রান্তে সুকানদীঘি বন্দর অবস্থিত ছিল। এই বন্দরের পশ্চিম পার্শ্বে অগাধ সলিল পরিপূর্ণ বিশাল দেবীদীঘি। এই দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্বে অতুাচ্চ পরিখা। চাবিদিকের পরিখার গড়খাই খোদিত করিযা চাবিটী সুপ্রশস্ত রাস্তা সর্ব্বসাধারণের গতায়াতের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই স্থান সমূহের প্রাচীন ভূস্বামী বুদ্ধিনারায়ণ এবং তদূর্দ্ধ পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন। বলহরি সর্দ্দার এবং তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ অত্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী এবং ডাকাতি কার্য্যের সর্দ্দার ছিলেন। তন্ত্রে, মন্ত্রে, কি কৌশলে, কোনও ডাকাতির দলাধিপতি তাঁহাদের সমকক্ষ যোদ্ধা ছিল না ইহাই লোকের বিশ্বাস। "ভীষণা কালিকা" পূজা দিয়া তাঁহারা যে দিবস লুণ্ঠন কার্য্যে ব্রতী হইতেন, সেই দিবস অবশ্যই কোন এক ধনাঢ্য-গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করতঃ প্রচুর ধন রত্নাদি সংগ্রহ করিতেন, কখনই শূন্য হস্তে প্রত্যাগমন কবিতেন নাই। এই কালে সামান্য গৃহস্থ হইতে, প্রভূত ধনশালী ব্যক্তির কমৃতাবিহার রাজ্যে বসবাস করা এক প্রকার কঠিন হইয়াছিল। ধনবান ব্যক্তিবর্গ প্রায় নিশা-সমাগমে আহারান্তে ভাই, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী পরিজন লইয়া প্রজাগৃহে. প্রতিবাসী-

ভবনে, গো-গৃহে, মেষপালে কিংবা অশ্বশালে অবস্থান পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিতেন।

কিংবদন্তি এই যে, বলহরি সর্দ্দারের কটি দেশে অষ্টপ্রহর কোষোন্মুক্ত অসি ঝুলিয়া থাকিত। প্রত্যেক গৃহে ডাকাতির সরঞ্জাম অস্ত্র সস্ত্রাদি সজ্জিত থাকিত। সাধনবলে ভীষণা কালিকা মুহুর্মুহু তাঁহাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিতেন। তিনি স্ত্রীসহ অন্দর মহলে বাস করিতে ভাল বাসিতেন না। গৃহের বহির্বাটীতে শয়ন করিতেন। সহসা ঘুমের সময় কেহ তাঁহাকে ডাকিত না। নিদ্রাবস্থায় ডাকিলে তিনি নিষ্কোসিত অসি লইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইতেন।

বলহরি সর্দ্দারের জীবিতাবস্থাতে তরসানদী কর্ত্তৃক তাঁহার প্রকাণ্ড বাটীর সৌন্দর্য্যমালা বিনষ্ট হয়। শৈল-প্রসূতা তরসা যে সময় বলহরি সর্দ্দারের সাধের বড়বাড়ী উত্তাল-তরঙ্গমালা কর্ত্তৃক খণ্ড বিখণ্ড করিয়া অনন্ত সলিল রাশিতে বিলীন করে, সেই সময় সেই দৃশ্য অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় গ্রামস্থ বহুলোক সমাবেশ হইয়াছিল।

বলহরি সর্দ্দারের বাড়ীর চত্বরে অসংখ্য পরিমাণে চারচালা, বাঙ্গালা ঘর অবস্থিত ছিল। রসাল,বেল, পানিয়াল, পেয়ারা, কাঁঠাল,আমড়া, লেবু প্রভৃতি সুস্বাদু বিটপীনিকর তাঁহার বড়বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে পরিশোভিত ছিল। সহসা দর্শনে যেন একটী রম্য-উদ্যান বলিয়া ভ্রম হইত।

"সর্দ্দার কাছারী" নামে অত্যুচ্চ বাঙ্গালা গৃহের উত্তরে, অশীতি হস্ত দূরে, সদর রাস্তার সম্মুখে, গগন চুম্বী অশ্বত্থ বিটপী যুগল প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন পুরঃসর, শাখা প্রশাখা বিস্তার করতঃ সর্দ্দারের বাড়ীর সম্মুখ দ্বারে যুগ্মমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিল। দেখিলে ইহাই অনুমিত হইত, যেন ভগবান বৃক্ষরূপে ভক্তের দ্বারদেশে বাহু উত্তোলন করিয়া,অভিমত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া বলিতেছেন—"ওহে ভক্ত! তোমরা আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতে। এই হেতু তদীয় অমিয় সমান মধুর সম্বোধন বিস্মৃত হইতে পারি নাই। হে প্রাণাধিক প্রিয়ভক্ত! তৎপ্রতিদান স্বরূপ তোমাকে অত্যন্ত বীরপুরুষ করিতে ভুলি নাই। এবং অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিতে পারি নাই, পরন্তু তিলার্দ্ধ অদর্শনে তিষ্ঠিতে পারি না বলিয়া, বৃক্ষরূপ যুগল-মূর্ত্তিতে তোমার সম্মুখস্থ দ্বারদেশে, শাখা পল্লবাচ্ছাদনে অবস্থান করিতেছি। অতএব হে বৎস! আমার ছায়াগর্ভে থাকিয়া তোমরা সর্ব্বদাই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে।

বলহরি সর্দ্দারের পূর্ব্ববংশ-পরম্পরা দ্বারা সঞ্চিত রজত, কাঞ্চন, টাকা, মোহর, এবং নানা ধরণের তৈজসপত্রাদি ও গহনার মাইট বা মৃন্ময় মুদ্রাধার, ডাকাতির সরঞ্জাম যথা— ঢাল, তলোয়ার বর্শা, কুঠার, ছব্বল, গড়ীয়া, সাঁই প্রভৃতি ঐ বিটপীদ্বয়ের নিম্নদেশে প্রোথিত ছিল। মাইট এবং অস্ত্রাদিতে শৃঙ্খল সংযুক্ত থাকায় সর্দ্দারগণ তাহা অনায়াসে টানিয়া বাহির পারিতেন।

বলহরি সর্দ্দারের দ্বারস্থ যুগ্ম অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া, তরসা নদী যখন সেই সকল গচ্ছিত ধন রত্ন এবং অস্ত্র-সস্ত্রাদি সলিলে নিমজ্জিত করেন,সেই সময় বৃক্ষদ্বয়ের মূলদেশ হইতে

ভূরি ভূরি তপ্তকাঞ্চন প্রভাযুক্তসর্প কেহ মাইটের গলদেশ, কেহ অস্ত্রাদিতে জড়িভূত হইয়া, সর্দ্দারগণের সাধের ধন-রত্নাদির সঙ্গে নদীগর্ভে শায়িত হইয়াছিল। বলহরি সর্দ্দার তদ্দর্শনে কপালে করাঘাত করতঃ মূর্চ্ছিত হইলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—হা অদৃষ্ট! আজ একি হইল! মা শবাসনা! তোমারই বাসনা পূর্ণ হইল। মা কল্যাণদায়িনি! মা কাত্যায়িনি! পুত্রের প্রতি কি এই স্নেহের উপহার প্রদত্ত হইল মা? আজ বুদ্ধি, বল, ভরসা, সাহস সবই যে আমাকে ছাড়িয়া চলিল। আমি এমন অসহায় অবস্থায় কার কাছে দাঁড়াব। এ অসহায় অবস্থায় কে আমাকে বিশ্বাস করিবে। শত্রুকুল যে হাসিবে মা? হায়! হায়! কুল-গৌরব এত দিনে আমাকে ত্যাগ করিলেন। *

বলহরি সর্দ্দার এবং তদূর্দ্ধতম দিবাপিতৃগণ কালী উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের বড়বাড়ীর সম্মুখ দ্বারদেশের যুগল অশ্বথ বৃক্ষমূলই তাঁহাদের সাধনপীঠ ছিল। সর্দ্দারগণ ঐ বিটপীমূলে কালিকার উপাসনা করিত, প্রতিদিন পূজা, আহ্নিক, স্তোত্র, ধ্যানাদি করিতেন। অমাবস্যা পর্ব্বাদিতে যজ্ঞাদি করিয়া ছাগ বলিও প্রদান করিতেন। উক্তরূপ কর্ম্মের পর নিশাযোগে স্বদলবলে ভীষণা কালিকার নিকট আশানুরূপ বর প্রার্থী হইতেন। কালিকা দেবী স্বয়ং দর্শন দানে তাঁহাদের অভিলষিত ফললাভের আদেশ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করিতেন।

প্রাগুক্ত বলহরি সর্দ্দারের বড়বাড়ী, বঙ্গাব্দ ১২৬৮ সালের শ্রাবণ মাসে জলমগ্ন হয়। তৎপর ১২৭০ বঙ্গাব্দে অশীতিতমাধিক বয়সে বলহরি সর্দ্দার ইহলোক ত্যাগ করেন।

বলহরি সর্দ্দারের বৃদ্ধপ্রপিতামহ আদিত্য সর্দ্দার। ইহার জ্যেষ্ঠ নন্দন সিন্ধু সর্দ্দারের বংশধরগণ মধ্যে ষষ্ঠপুরুষ বলহরি সর্দ্দার। বলহরি সর্দ্দারের পিতা বুদ্ধি সর্দ্দারের দুই বিবাহ হয়। সহধর্ম্মিনী সিন্দুমতির গর্ভে গৌরহরি, এবং দ্বিতীয়া পত্নী ইন্দুমতির গর্ভে বলহরি সর্দ্দার জন্মগ্রহণ করেন। বিমাতৃজাগ্রজ গৌরহরি সর্দ্দার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। বলহরি সর্দ্দার তিনবার দারগ্রহণ করেন। রূপেশ্বরী জ্যেষ্ঠা, হরিকুমারী দ্বিতীয়া, বিন্দুসুন্দরী তৃতীয়া পরিণীতা পত্নী। ইহাদের ক্ষেত্রে ছয়জন পুত্র, তিনজন কন্যা জন্মলাভ করেন। পুত্রগণের নাম যথা—হরিদাস, কৃষ্ণদাস, শ্রীকান্ত, শ্রীমন্ত, অষ্টদেব, বসুদেব। তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে ৯ম সংখ্যক পুত্র বসুদেব জন্মের অল্পদিন পরে বলহরি সর্দ্দার মানবলীলা সম্বরণ করেন। বিন্দুসুন্দরী প্রথম যৌবন সময়েই পতি-বৈধব্য বিক্ষে জড়িভূতা হয়েন।

বলহরি সর্দ্দারের বংশ পর্য্যায় এবং জীবন কাহিনী এই পর্য্যন্তই বলিলাম। এক্ষণে তাঁহার অলৌকিক ডাকাতি রহস্য সংক্ষেপে বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রঙ্গপুর অন্তর্গত "বেলতলা" অতি প্রাচীন

* তরসার ভীষণ প্লাবনে, বলহরি সর্দ্দারের বিটপীদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ধনাদি জলমগ্ন হয়; সেই সময়ের স্মৃতি লেখনী মুখে বর্ণিত হওয়া অসম্ভব। ফলতঃ সেই সকল বিবরণী যাহা প্রাচীনদের প্রমুখাত শ্রুত হওয়া গিয়াছে, অনুসারেই মূলতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা হইল।

বন্দর। ইহার অপর নাম বাউরা। বাউরা-বন্দরে অনেক দেশী বিদেশী ধনকুবেরের বাস ছিল। এই কালে এদেশ বাসীর মধ্যে বেলতলা সুপ্রসিদ্ধ যৌথ কারবারের আড্ডা। বেলতলায় ডাকাতি করার অভিপ্রায়ে, বলহরি সর্দ্দার তাঁহার স্বদলবলে, তথায় পঁহুছিয়া মহাজনগণের সিন্ধুক পূর্ণ রজত মুদ্রাদি অপহরণোদ্দেশ্যে এক অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ ঘটনা আবিষ্কার করিলেন।

সেদিন অমানিশার অন্তে, চন্দ্রের দ্বিতীয়া কলা ঈষৎ বক্রভাবে গগনে সমুদিত। বন্দর-বাসী ঘরে ঘরে দীপদানে ব্যগ্র। সূর্য্য-দেব পাটে বসিয়াছেন। সাধু-সন্ন্যাসী সন্ধ্যা-দেবীর পদবন্দনায় পদধৌত করিতে উদ্যত। বেলতলা বন্দরের উত্তরদিকে সহসা বরযাত্রার বাদ্যোদ্যমে সহর মুখরিত হইয়া উঠিল। হাতী, ঘোড়া, দোলা, সিপাই, প্রভৃতিতে মাঠ পরিপূর্ণ হইল। সহরবাসী দর্শকবৃন্দের সম্মুখে বাদ্যের লড়াই, আতশ বাজী, নাচ,গান, ক্রীড়া, কৌতুক কতই প্রদর্শিত হইল। তাঁহারা একবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া চিত্ত-পুত্তলিকাবৎ তাহা দর্শন করিয়া মোহিত হইতে লাগিলেন।

অতঃপর বলহরি সর্দ্দারের অনুগামী দস্যুদল বেলতলা বন্দর নিবাসিগণের প্রতি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া সিন্ধুক, আলমারী, ডেস্ক,পেটেরা ইত্যাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া চম্পট দিলেন।

আর কোথায় বা হয়হস্তী, কোথায় বা আতশ বাজী। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অসংখ্য ধন-রত্নাদি লইয়া সরিয়া পড়িলেন। কেহ তাহাদের অনুসরণ করিতে সাহস করিল না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা সরকার।

---

# সার হেনরি কটন।

ভারতের পরম হিতৈষী সার হেনরি কটন গত ২৩শে অক্টোবর তারিখে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে এ দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা কখনও পূর্ণ হইবে কিনা ভগবান জানেন।

সার হেনরি কটন ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মান্দ্রাজ প্রদেশের সিবিলিয়ান ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে হেনরি কটন সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে এদেশে আগমন করেন। এদেশে আসিয়া তিনি চট্টগ্রামের এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর পরে তিনি আণ্ডার সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে কলিকাতা হাইকোর্টের রেজিষ্টারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি কতক দিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করেন এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্য্যও নির্ব্বাহ করেন। ছয় বৎসর রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারির কার্য্য করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্‌সিয়াল সেক্রেটারির কার্য্য করেন এবং তৎপর তিনি বেঙ্গল গবর্ণ-মেণ্টের চিফ সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হন। ছয় বৎসর চিফ সেক্রেটারির কার্য্য করিয়া তিনি ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তৎপরে আসাম প্রদেশের চিফ্ কমিশনারের পদ গ্রহণ করিয়া তদানিন্তন বড়লাট কর্জ্জন সাহেবের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন।

সম্পাদক।

# কবির বৈঠক।

বঙ্গের বাহিরে যাঁদের বাস, কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারের নাম শুনিযাই তাঁদের মনে একটা খটকা লাগিতে পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় যাঁদের বাড়ী—তাঁহারা বৈঠক ও বৈঠখখানার মর্ম্ম বিশেষরূপে বুঝেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বাঙ্গালার বৈঠকখানার তুল্য ঐতিহাসিক কীর্ত্তি জগতে সুদুর্লভ। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণেব মুখে শুনিতে পাই, দিল্লীতে "কুতব মিনর", আগ্রায় "তাজ-মহল", বেহাবে "অজন্তা-গুহা", কোনার্কের "মান-মন্দির" ইত্যাদি ইত্যাদি কত বিধ কীর্ত্তি স্তম্ভ ভারতের নানা প্রদেশে রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায বাঙ্গালায় তেমন গৌরব করিবার কিছুই নাই। কিন্তু কথাটা বেমালুম ভাবে হজম করিয়া লওয়া যাইতে পারে কি? যাঁহারা অন্ততঃ পক্ষে তিরাত্রিকাল বৈঠখখানায় যাপন করিযাছেন, তাঁহারা তারস্বরে নিশ্চয়ই বলিবেন—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বৈঠকখানায় কখনও পদার্পণ করেন নাই। তা যদি করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন ইহার মর্ম্ম, বুঝিতেন ইহার নেশা, বুঝিতেন ইহার প্রভাব। কত লুকান কথা, কত পুরাণ গাঁথা; কত নবীন তত্ত্ব—কত প্রাচীন তর্ক; কত ভবিষ্যতের ভাবনা, কত বর্ত্তমান চিন্তা স্রোত—বাঙ্গালার বৈঠকখানার, তাকিয়ার গায়ে ঠেসান দিয়া, বৈঠকেব পৈটায় ঠক্ ঠক্ করিয়া বেড়াইতেছে। কে তার তত্ত্ব রাখে, কে তার ইতিহাস লেখে—কেবা তার অকথিত মর্ম্মবাণী অনুভব করে। এ হেন বৈঠকখানা থাকিতে বাঙ্গালায কোন ঐতিহাসিক কীর্ত্তি নাই, এ কথা কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া বলিতে পাবা যায়?

এ বিচিত্র স্থানের ভক্ত নয় কে? অভক্তই বা কাহারা? বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলের এখানে অবাধ প্রবেশ বিধি বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের জাতি বিচার নাই, উভয়ে এক তাকিয়া ঠেসান্ দিয়া অবলীলা ক্রমে একই কথা আলোচনা করিতে পায। পুরুষোত্তমের আনন্দবাজাবের লীলা-খেলা—বাঙ্গালার বৈঠক খানায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এহেন মহামহিম, এ হেন পৌরাণিক, এহেন সার্ব্বভৌমিক বৈঠক-খানার উদ্দেশে প্রথমে বার বার জয়োচ্চারণ করি।

বলিয়াছি, বৈঠকখানায় নানা বর্ণের লোকে নানাপ্রসঙ্গের আলোচনা করেন। ইদানীং বঙ্গের নানা স্থানে নানা ভাবে কবির বৈঠকও বসিতেছে। ভারতে এখন "congress" বা "রঙ্গরসের" বৈঠক বসিতেছে, Industrial বা "হীন ভ্রাতৃবলের" বৈঠক বসিতেছে, Social

conference বা "শিয়াল কম্পনের" বৈঠক বসিতেছে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে, "অমাবস্যা বিরোধ," "একাদশী একাকার," "সংক্রান্তি সংযোগ" অথবা "চড়ক চক্রান্ত" এইরূপ যা হয় একটা নাম দিয়া কবির বৈঠকও বসিতেছে।

পূর্ব্বে বঙ্গে কবির দল ছিল, কবিরা চামর মন্দিরা লইয়া আসরে নামিতেন। পরবর্ত্তী কালে কবিদের মধ্যে দলাদলি হইলেও বাঁধা আসোরেই তাঁহাদের লড়াই হইত। এখন কবিরা বৈঠকে বসিয়া কবিতা আওড়াইতেছেন। এখন কবির দল আসোর ছাড়িয়া "বৈঠকে" বসিতেছেন কেন? ইহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

সে কথা ভাবিতে গেলে, ইহা অগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে—বৈঠকে আর কি শোভা পায়। এ জিজ্ঞাসার উত্তরে, একটী পঞ্চম বর্ষীয় শিশু পর্য্যন্ত বলিয়া দিবে যে বৈঠকে হুঁকা বসে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, যখন হুঁকা এবং উভয়ই বৈঠকে বসিবার অধিকারী তখন উভয়ের মধ্যে কোন না কোনরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে। সে সাদৃশ্য কি পরিমাণে আছে, এখন তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক। তৎপূর্ব্বে এটুকু বলি,—বৈঠকে যেমন থেলো,বাঁধা ও কলি প্রভৃতি সকল হুকাই শোভা পায়—কবির বৈঠকে সেইরূপ কলি কবি, থেলো কবি ও বাঁধা কবিরাই শোভা পান। যাঁহারা মাসিক কাগজে কবিতা লেখেন, ছাপান নাই—তাঁহারা হইলেন "থেলো কবি।" যাঁহারা একখানি চটি কবিতার কেতাব বাহির করিয়াছেন—তাঁহারা হইলেন "কলি" কবি, আর যাঁহারা সোনার জলে আঁকা রূপার কির্কিরে কাটা বাঁধানো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাঁহারা হইলেন "বাঁধা কবি"। তবে যাঁহারা কবিতা বুঝিতে পারেন না বা কবি হইবার আশা যাঁহাদের নাই—তাঁহারাই হইলেন "গড়গড়া"; কাজেই তাঁহারা বৈঠকে বসিতে পান না, উহার আশে পাশে গড়াইয়া বেড়ান মাত্র।

আবার হুঁকার মাথায় ফুটন্ত কলিকা বসাইয়া টান মারিলেই ভড়্ ভড়্ করিয়া ধুম নির্গত হয়। কাব্য-কলিকাও যখন ফুটিয়া উঠে তখন অধর সংস্পর্শ হইলেই তর্ তর্ করিয়া কবিতা বাহির হয়। অবশ্য তামাকের ধুম ও এই তরতরে কবিতার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য যে নাই এমন নহে। উভয়ই সামান্য লক্ষণাক্রান্ত—উভয়েই ক্ষণস্থায়ী।

বোধ হয় এই সব চিন্তা করিয়াই আজ পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা, শিশুবোধকে প্রকাশিত "দাতাকর্ণ" রচয়িতা শ্রীকবিচন্দ্র হুক্কার প্রতি প্রীতিভরে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হুক্কাং কৃষ্ণবর্ণাং দ্বিনেত্রাং উর্দ্ধ দণ্ড ধরাং
ধুতুরা পুষ্প সমন্বিতাং বরুণ বহ্নি সংযুক্তাং।"

হা হুক্কায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হাং হুক্কায়ৈ নমঃ।

"হুক্কে হুক্কে মহাভাগে বৈঠকোপরি সংস্থিতে
সর্ব্বরোগ হরে দেবী! ধুমোদ্গার নমোহস্তুতে।
তাম্রকূটং ন খাদন্তি যো নিন্দন্তি নরাধম্
শৃগালযোনি সংপ্রাপ্য হুকা হুকা সদারবেৎ

তবে একান্ত পক্ষে যাহারা হুকা সেবনে

অসম্মত, তাহাদের জন্য তিনি এ ব্যবস্থা দিলেন যে—

"প্রশান্ত দৃষ্টি ! দৃঢ় দন্ত কেশাঃ শশাঙ্ক বক্ত্র
কমলস্য গন্ধ পিকান্ত কণ্ঠ পলিত বিহীন !
নস্যোপভোগী ভরতীহ লোকে।"

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—"শুনিতে পাই, জগতে সাতটী আশ্চর্য্য পদার্থ আছে কিন্তু এখন সে ভ্রম ঘুচিল। বুঝিলাম—"কবির বৈঠক" জগতে অষ্টম আশ্চর্য্য বস্তুর গৌরব পাইবে। আর পরবর্ত্তী কালের পয়াব কর্ত্তাবা গাহিবেন।

কবি বৈঠকের কথা অমৃত সমান
দ্বিজ গৌরদাস ভণে শুনে পুণ্যব.ন ॥

আর হয়তো ভবিষ্যতে, বঙ্গপল্লী ললনারা বঙ্গের হঠাৎ কবিদের কাব্য কলায় আকৃষ্ট হইয়া বিকালে মল বাজাইয়া জল সহিবাব কালে কলস্বরে কলরব করিবেন—

কবিতার জ্বালায় মলেম সজনী!
রাজা লেখে, প্রজা লেখে
কাব্যে লেখে রাজরাণী
কবিতার জ্বালায় মলেম সজনী!"

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

---

# আমাদের কথা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

তখনকার ছেলেদের জন্য এত স্কুল-কলেজের বেতন দিতে হইত না। মেসের খরচ এত বহিতে হইত না, রাশি রাশি বই খাতা কিনিতে হইত না। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য, এত জামা, কাপড়, পোষাক তখন লাগিত না,—মেলিন্সের খাবার, বেঞ্জারের খাবার, হর্লিকের দুধের গুঁড়া ছাড়াও শিশুরা সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহে বাড়িয়া উঠিত —এত ঠুন্‌কা পুতুল খেলনা ছাড়াও তাহারা আনন্দে খেলিত। আজ আসল ছাড়িয়া নকলে আমাদের রুচি হইয়াছে। যাহা বিনা ব্যয়ে পাওয়া যাইত, আজ তাহার জন্য আমাদিগকে যথেষ্ট ব্যয় করিতে হইতেছে। সমস্যা জটিল, সমাধানও জটিলতর। এখনও যদি আমাদের মতিগতি না ফিরে, তবে আর কল্যাণ নাই। মোটের উপর বাজে ব্যয়বাহুল্য কমাইতে হইবে —বিলাসিতা কমাইতে হইবে—কৃত্রিমতাকে ঘৃণা করিতে হইবে। চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই যে লক্ষ লক্ষ বালক ও যুবক—দেশমাতার অঞ্চলের ধন বঙ্গীয় ভদ্র-সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, ভবিষ্যৎ জীবন,—বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ প্রবেশ করিতেছে, কেহ সফলতার বরমাল্যে বিভূষিত হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহাদের লক্ষ্য ও চিন্তা কি, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ইহাদের প্রায় সকলেরই লক্ষ্য যে চাকুরী করিয়া জীবিকাৰ্জ্জন করিবে। কিন্তু এ কথা বুঝা উচিত যে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য লক্ষ লক্ষ চাকুরী তৈয়ারী নাই। কাজেই দেশের লোকের চিন্তা আজ স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের দিকে প্রধাবিত করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সহজ ও সুলভ নহে। কিন্তু সহজসাধ্য না হইলেও অসাধ্য নহে। দেশের দারিদ্র্য দূর করিয়া, সম্পদ বৃদ্ধি

করিয়া, দেশের লোকের জীবিকার সংস্থান করিতে হইলে, এই দুঃসাধ্যকেই আজ সহজ-সাধ্য করিয়া তুলিতে হইবে। অন্যথা আমাদের উন্নতির গতি সুদূরপরাহত।

মধ্যবিত্ত ভদ্র-সম্প্রদায়ের দুরবস্থার আর একটী কারণ এই যে খাদ্য-দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য। খাদ্য হইতে খাদকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হয়। দেশোৎপন্ন খাদ্য-শস্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। জনসংখ্যার পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন অবস্থায় প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য-শস্যাদির উৎপাদন কল্পে ভদ্রাভদ্র কাহাকেও নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। আমরা পল্লীগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সহর করিতেছি—ইহা অনেকটা কাস্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়ানের মত হইতেছে। অথচ তাহাতে আমাদের দুরবস্থা অপনোদিত হই-তেছে না। বরং সহরের বায়বাহুল্যের তরঙ্গে পড়িয়া আমরা আরও হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে কাস্তে অপেক্ষা করতালের প্রয়োজন বেশী নয়। বাঙ্গালা দেশে সহরের সংখ্যা ও লোকের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে। অবশ্য ইহাতে কোন কোন বিষয়ে আমাদের যে সুবিধা হই-তেছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের উপর বাঙ্গালার সাধারণ অবস্থা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যেমন ছিল, তদপেক্ষা ভাল হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে সহরের সংখ্যা,সহরবাসীর সংখ্যা ও জনসংখ্যা কিরূপ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, গত ১৯১১ সনের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত একটী বিবরণী হইতে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। অন্যান্য জেলার কথা না বলিয়া আমরা কেবল আমাদের ২৪ পরগণা জেলার কথাই কহিব।

মধ্যবঙ্গে ২৪ পরগণা জেলায় সহরের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ১৯০১ সন হইতে দশ বৎসরে এই জেলায় গড়ে সহরবাসীর সংখ্যা শতকরা ৩৮ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গঙ্গা-নদীর তীরস্থ পল্লীসমূহ প্রায় সহরে পরিণত হইয়া উঠিতেছে। সাউথ সাবার্ব্ব, বারাকপুর ও নৈহাটি মিউনিসিপালিটি, এই কয় বৎসরে দুইবার বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমানে নয়টী মিউনি-সিপাল সহরে পরিণত হইয়াছে। এই জেলায় বর্ত্তমানে ২৬টী সহর আছে, ইহার মধ্যে কাশী-পুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, গার্ডেনরীচ, সাউথ-সাবার্ব্ব, এবং টালিগঞ্জ। এই ৫টী কলিকাতার সংলগ্ন এবং তাহার অংশ বিশেষ বলিলেও হয়। এই ৫টী সহরের জনসংখ্যা গত ১০ বৎসরে গড়ে শতকরা ৪০ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ খাস কলিকাতার জনসংখ্যা মাত্র ৫০৭ জন হারে বাড়িয়াছে। এই জেলার দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকগুলি সহর শিল্প-বাণিজ্যের জন্য উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র বজবজ ব্যতীত এই সহরগুলি সকলই কলিকাতার উত্তরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে, বরাহনগর, কামারহাটী, নৈহাটী, হালিসহর, ভাটপাড়া, টিটাগড়, বজবজ এবং গাড়ুলিয়া—এই সহরগুলির জনসংখ্যার বৃদ্ধি অত্যন্ত বিস্ময়জনক,—গত দশ বৎসরে বৃদ্ধির সংখ্যা শতকরা ৬৭ জন। দক্ষিণ বারাকপুর, উত্তর বারাকপুর এবং পানিহাটি তাহিরপুর

তীরস্থিত আর তিনটী সহর। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের প্রাধান্য অভাবে ইহাদিগের তেমন শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। অবশিষ্ট সহরগুলি প্রায়ই নদীতীর হইতে দূরে অবস্থিত, ইহাদিগের বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই—জনসংখ্যা মাত্র শতকরা ৬ জন হারে বাড়িয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—দেশের জনসংখ্যা ও সহরের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ তদনুপাতে উৎপন্ন খাদ্য-দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। বস্তুতঃ ইহাও বর্ত্তমান জীবিকা সমস্যার এক প্রধান কারণ। এই সমস্যার সমন্বয় কল্পে দেশবাসীমাত্রেই সচেষ্ট হউন, ইহাই আমাদের চিরকাতর প্রার্থনা।

এইত গেল কলিকাতার একটি সামান্য অংশের কথা। পল্লীগ্রামেরও কথা তদনুরূপ, উলা সোমড়া, গুপ্তিপাড়া, হালিসহর, চক্রদ্বীপ, কুমারহাটী, নবদ্বীপ, ২৪ পরগণা, বাওয়ালী, জয়নগর, বশিরহাট, বাদু, বারাসত, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সোণার বাঙ্গালার সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা তাল-তমাল-বনরাজিনীলা, সুখ-শান্তির চির লীলা-নিকেতন, সোণার পল্লীগ্রামগুলি যেন ক্রমশঃই ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই ধ্বংসের মুখ হইতে পল্লীগ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার কি কোনই উপায় নাই? বাঙ্গালার সোণার পল্লীসমূহ কি এইরূপেই দিন দিন শ্মশান হইয়া যাইবে? পল্লীর দুঃখ-দুর্গতির কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। পল্লীর করুণ কাহিনী লইয়া আমরা বহুবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি,—জানিনা, তাহাতে কয়জনের প্রাণ আর্দ্র হইয়াছে,—জানিনা, তাহাতে কয়টী হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে? সে কথা জানি, আর না জানি,—একথা নিশ্চয় জানি যে, পল্লীই বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার প্রাণ—পল্লী পরিত্যাগ করিয়া—পল্লীর প্রতি অমনোযোগী হইয়া—পল্লীলক্ষ্মীর প্রতি অযত্ন করিয়া বাঙ্গালী বস্তুতঃই আজ ধনে-প্রাণে মজিতে বসিয়াছে। যদি বাঁচিতে হয়, বাঙ্গালীকে আবাব পল্লীর সুখ-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। পল্লীর প্রতি অমনোযোগী হইয়াই বাঙ্গালীব আজ এই মহা সর্ব্বনাশ! বাঙ্গালীর এক একটী উন্নত পল্লী, ক্রমে কিরূপ শ্মশানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে—আজ পাঠকবর্গকে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থাদি স্বচক্ষে দর্শন এবং উহার অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিবার জন্য আমরা আপাততঃ এ জেলার কতকগুলি পল্লী পরিভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছি। সঙ্কল্পানুযায়ী সম্প্রতি আমরা গোবরডাঙ্গা গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। গোবরডাঙ্গায় প্রায় দুই দিন অবস্থানপূর্ব্বক আমরা উক্ত গ্রামের অবস্থাদি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং উক্ত গ্রামের অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি,—নিম্নে তাহাই পত্রস্থ করা হইল।

গোবরডাঙ্গা যমুনাতীরস্থ একটী প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামটী কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইলের ব্যবধান মাত্র। গ্রামটী দেখিলেই

মনে হয়,—এক সময় উহা সর্ব্বপ্রকারেই সুখ-সমৃদ্ধির লীলা-নিকেতন বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু ইদানীং সেই সুখ-সমৃদ্ধির আর বিশেষ কিছুই নাই। কেবল সেই সুখ-সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ বুকে লইয়া গ্রামটী পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। সুখের যাহা কিছু উপাদান,—গ্রামটীতে তাহার সকলই বর্ত্তমান আছে,—কিন্তু সুখের উপাদান সত্ত্বেও, লোকের মনে যেন সুখ নাই। নিদারুণ ম্যালেরিয়া লোকের সকল সুখেই বাদ সাধিয়াছে। গ্রামে রাশি রাশি ফলের বাগান,—তাহাতে অসংখ্য-অগণ্য আম্র,কাঁঠাল,নারিকেল, তাল ও খেজুর গাছ,লতা পাতা ও জঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তাঘাটগুলিও একটী গ্রামের পক্ষে যতদুর সম্ভব, উৎকৃষ্ট। কিন্তু পথগুলি প্রায়শঃ নির্জ্জন। দুরন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ক্রমেই গ্রামটীকে জনশূন্য করিয়া তুলিতেছে। গ্রামে অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে,—কিন্তু তাহার অধিকাংশই জলশূন্য, কোনটীতে জল যৎসামান্য যাহা আছে, তাহাও পানের অযোগ্য এবং অব্যবহার্য্য। গ্রামটীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিতা,—কিন্তু নদীটীর বর্ত্তমান অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহাতে উহাকে নদী না বলিয়া একটী ক্ষুদ্র খাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নদীতে স্রোত একরকম নাই বলিলেও চলে। স্থানে স্থানে জলজ জঞ্জাল ও লতাগুল্ম উৎপন্ন হইয়া নদীবক্ষ প্রায় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। নদীবক্ষে যৎসামান্য জল। ফাল্গুন চৈত্রমাসে নদীর কোন কোন স্থান একেবারে শুষ্ক হইয়া মাঠের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। অথচ এই নদীর জলই সমস্ত গ্রামবাসীর পানাহার ও স্নানের একমাত্র সম্বল।

গ্রামটীতে রাজা না থাকিলেও রাজপ্রতিম দুই এক ঘর সম্ভ্রান্ত জমিদার আছেন। ইঁহাদের রাজপ্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ অট্টালিকা ও উদ্যান বাটী প্রভৃতি আছে। রায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখার্জ্জি বাহাদুর এবং তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন মুখার্জ্জি প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এক্ষণে গোবরডাঙ্গার জমিদার পদে সমাসীন আছেন। ইঁহারা বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক এবং সৎকার্য্যের চির উৎসাহদাতা। ইঁহারা আছেন বলিয়াই গ্রামটী মরিতে মরিতেও আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। গোবরডাঙ্গার যে কোন সদনুষ্ঠানের মূলে ইহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি বিদ্যমান আছে। বলিতে গেলে ইঁহারাই এ গ্রামের প্রাণস্বরূপ।

এ গ্রামের অন্যান্য প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই অতি পুরাতন পাকা গৃহ ও পাকা প্রাচীর দেখিলাম। কিন্তু অধিকাংশই জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়। গ্রামে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বাস। কিন্তু অধিকাংশই এক্ষণে দরিদ্র। কেবল তাঁহাদের প্রাচীন ও জীর্ণ পাকা গৃহগুলি এবং ভগ্নপ্রাচীর সমূহ তাঁহাদের অতীত সৌভাগ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় দান করিতেছে। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী দেখিলাম,—জনমানব শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে! শুনিলাম,—গৃহস্বামীরা চিরসহরবাসী! কাজেই উহা এক্ষণে পশুপক্ষীর আবাসস্থলে পরিণত হইতে চলিয়াছে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামটী এক সময়ে বেশ সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে একেবারেই যেন ধ্বংসোন্মুখ।

গ্রামবাসীদের চেহারা দেখিলেই মনে হয়, ম্যালেরিয়া ক্রমশঃই যেন তাঁহাদিগকে অন্তঃসারশূন্য ও একবারে অসার করিয়া ফেলিতেছে। কেবল ম্যালেরিয়াই যে সকল পল্লীর অবনতির কারণ, এমন কথাও বলা যায় না। এমন অনেক গ্রাম দেখা যায়, যেখানে ম্যালেরিয়া নাই অথচ সে সকল গ্রামও ধ্বংসের পথে অগ্রসর। ইহার কারণ পল্লীর প্রতি পল্লীবাসীর অমনোযোগ। যতদিন পর্য্যন্ত সহরের ভোগবিলাসিতার মোহ-মদিরায় আমরা আত্মহারা থাকিব, ততদিন আমাদের কল্যাণ নাই।

ভোগবিলাসিতা ত আমাদের সহিবে না। ত্যাগী ও বৈরাগীর আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত সন্তান আমরা,—আমাদের এ ভোগ সহিবে না। ভোগবিলাসিতায় আমাদের যথার্থ শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া অসম্ভব। ত্যাগের পথে, বৈরাগ্যের পথেই আমাদের চলিতে হইবে। যতদিন আমরা এ কথা না বুঝিব, ততদিন সহরের প্রতি আমাদের মোহ-মায়া ঘুচিবে না। যেদিন বুঝিব, ত্যাগই কল্যাণের পথ,—বৈরাগ্যই শান্তির নিদান, সেদিন আবার পল্লীর প্রতি আমাদের মায়া হইবে। সেদিন আবার পল্লীর শ্রী ফিরিবে।

এই যে ভীষণা ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রামের পর গ্রাম, আজ একেবারে উজাড় করিয়া ফেলিতেছে, চেষ্টা করিলে এই রাক্ষসীর হাত হইতে আমরা কি অর্দ্ধেক লোককেও উদ্ধার করিতে পারি না? মানুষের অসাধ্য যে কর্ম্ম নাই। চেষ্টা বলে অসাধ্যকেও সুসাধ্য করা যায়। গোবরডাঙ্গার কত ভদ্রলোকের বাসবাটীর চতুর্দ্দিক যে জঙ্গলাকীর্ণ দেখিলাম—কত বৃহৎ বাটীর আশে পাশে ম্যালেরিয়ার আকরস্থল দূষিত জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত যে ডোবা দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। চেষ্টা করিলে আমরা ইহার কি কোনই প্রতীকার করিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। নিজের কার্য্য নিজে করায় লজ্জার বিষয় আর কি আছে? কেবল গোবরডাঙ্গা সম্পর্কেই যে আমরা এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। প্রায় প্রতি গ্রামেরই এই অবস্থা। আর প্রতি গ্রাম সম্পর্কেই আমাদের এ পরামর্শ। আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আমাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে—আমাদিগের কল্যাণের জন্য আমাদিগকেই চেষ্টিত হইতে হইবে—আমাদিগের নিজকার্য্য আমাদিগের নিজ হস্তেই সম্পাদন করিতে হইবে। শক্তি সত্বেও নিজের কার্য্যের জন্য যাহারা পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, তাহাদের মত হতভাগ্য আর নাই। নিজের কার্য্য নিজে করাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আত্মশক্তির প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন না হইলে কোন জাতিরই কল্যাণ নাই। প্রতি পদে সরকার বাহাদুরের সাহায্য চাহিলে চলিবে না। যাহা নিজেরা পারিব, তাহা নিজেরাই করিব, এ প্রতিজ্ঞায় সকলকে আবদ্ধ হইয়া আজ আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। অন্যথা আমাদের অবস্থোন্নতির আর উপায়ান্তর নাই।

অবশ্য এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা আমাদের আত্মশক্তির সাধ্যাতীত। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে পরস্পর ঐক্য ও আন্তরিকতা থাকিলে কোন কার্য্যই সংসারে অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

এই যে যমুনা নদী আজ মজিতে বসিয়াছে, ইহার প্রতীকার কল্পে আমরা দেশবাসী আজ একমত ও একপ্রাণ হইয়া যদি সহৃদয় সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করি, তাহা হইলে মনে হয় সে আবেদন কখনই অরণ্যরোদনে পর্য্যবসিত হয় না। রেলপথ হওয়ার পর হইতেই গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে যমুনার গতি মন্দীভূত হইয়াছে। যমুনার উপর দিয়া লৌহময় রেলবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। যমুনার সে উদ্দাম গতি আজ আর নাই। যমুনা যেন আজ পাশবদ্ধা—মলিনা—কৃশা ; যমুনার তীরে সেদিন বেড়াইতে গিয়া,—যমুনার দুই তীরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া—আমাদের কবির সেই করুণ সঙ্গীত মনে পড়িল।

"যমুনে,—এই কি তুমি সেই যমুনে, প্রবাহিনী,
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্তমণি ॥
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু
মা যশোদা রোহিণী ॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা জলকেলি ;
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী !—
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে
বইতে তুমি আপনি ॥
তোমার তটে তটে, তোমার ঘাটে ঘাটে
তোমার সন্নিকটে কই সে ধনী !

হায়! নদীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মনে বড়ই ক্লেশ হইল। নদী এক সময় যে বেশ প্রশস্ত ছিল, নদীর তীর দেখিলেই বর্ত্তমান সময়ে তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নদী যে শীঘ্রই মরিয়া বা মজিয়া যাইবে,তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নদী মজিয়া গেলে গ্রামটী অচিরকাল মধ্যেই জনমানবশূন্য এক ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইবে। আমরা আজ এ বিষয়ের প্রতীকারার্থ বিশেষ ভাবে আমাদের মহামান্য সরকার বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গোবরডাঙ্গা গ্রামে এক সময় প্রায় শতাধিক চিনির কারখানা ছিল। এই সকল কারখানায় শত শত লোক কাজ করিত। এ সকল কারখানায় এত চিনি প্রস্তুত হইত যে সে চিনি দেশ বিদেশে চালান দিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ লাভবান্ হইত। বৈদেশিক চিনি ব্যবসায়ীগণের প্রতিযোগিতায় আজ সেই সকল কারখানার প্রায় সকলগুলিই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা দুইটী মাত্র চিনির কারখানা এক্ষণে বিদ্যমান্ দেখিলাম। একটী কারখানার কাজকর্ম্ম আপাততঃ বন্ধ আছে,—অপরটী "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইয়া কোনরূপে টিকিয়া আছে মাত্র। কারখানার প্রাচীর পরিবেষ্টিত বৃহৎ বাটী,উহার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠাদি, সুবৃহৎ উনুনসমূহ, উহার অভ্যন্তর ভাগ, এবং সাজ-সরঞ্জামাদি দেখিয়া মনে হইল যে একসময় অতি সুন্দররূপে এই সকল কারখানা পরিচালিত হইত। গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী খাঁটুরা নামে একটী স্থান আছে। এস্থানে বহুসংখ্যক ধনী ব্যবসায়ীর বাস। ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া এইস্থানের অধিবাসিগণ ধন-সম্পদে একসময় বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন। এখনও এখানে ধনীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এস্থলেও আছে।

এই প্রবন্ধে অধিকাংশ আমার লেখা হইলেও স্থানে স্থানে চোব্বিশ পরগণা বার্ত্তাবহ হইতে উদ্ধৃত করিবার লালসা পরিহার করিতে পারি নাই। এখন আমি সকল বিষয় এক এক করিয়া বলিয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান ঘোর জীবন-সমস্যার দিনে চাষের উন্নতি বিধান করা একান্ত প্রয়োজন। কৃষকদের অভাব-মোচনের পথ সহজ হওয়া প্রয়োজন হইলে তাহাদের রাজ-দরবারে প্রতিনিধিত্ব দান করা কর্ত্তব্য। তাহা আমাদের সহৃদয় সাশকগণের সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা বিশেষ প্রযোজন। কৃষিবিভাগের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। এখন দেখা কর্ত্তব্য যে কৃষির উন্নতি হইতে পারে কি প্রকারে? দেশে গরিমা সমিতি, কৃষকদের সাহায্যার্থ ক্রেডিট সোমাইটি, গোনয়ন শুল্কের হ্রাস ইত্যাদি যে যে বিষয় আমি পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি তাহার আশু প্রবর্ত্তন দেশে হওয়া উচিত। বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া কৃষকদের শ্রমের সার্থকতা বুঝা দরকার, ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাশ্চাত্য দেশের মত কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। Bengal Agricultural Peasant Association অথবা বঙ্গীয় মাহিত্য-সমিতির অন্তর্গত কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাতে প্রত্যেক বঙ্গের কৃষককে যোগদান করা কর্ত্তব্য। উপ-রোক্ত বঙ্গীয় Peasant এসোসিয়েশান সম্বন্ধে Mr. M. Naziruddin Ahmed এর নিকট ২৭।১ নং আকুনি বাগান লেনে পত্র দিলে সবিশেষ তথ্য জানা যাইতে পারে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগে পুনঃ সংস্কার করা বিশেষ প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। অনেক বলিবার বিষয় এ সম্বন্ধে আছে তাহা ক্রমশঃ বলিব। তবে এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আমার এক কথা বলা আবশ্যক যে আমাদের দেশীয় সংবাদপত্র সমূহে আমা-দের অভাব-অভিযোগ গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করা এবং তীব্র আন্দোলন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

## শ্রীগৌরাঙ্গের মোহন রূপ।

হৃদয় নিরমল হ'লে—
　　ফুটে এ মোহন রূপ,
　　　　সে কি রূপ, না মিলে তুলনা।
প্রেমময় রূপ ওই—
　　বিরাজে মনের মাঝে,—
　　　　এ যে গো চিন্ময়-রূপ নহে ত কল্পনা॥

রাধাভাব কান্তিযুত, 　　এ যে রূপ সুললিত,
　　ঝলকে ঝলকে সুধা বর্ষে।
চিত্তের মালিনা কাটে, 　　অন্তর ফুটিয়া উঠে,
　　মায়ার অতীত ভাব স্পর্শে॥

পরাণ আলোক করা, 　　দিব্য সুষমায় ভরা,
　　ওই রূপ কি লাবণ্যময়।
ভাব দ্যুতি ছড়াইয়ে, 　　হিয়া দেয় জুড়াইয়ে,
　　নবযুগে নব ভাবোদয়॥

শ্রীরাধা ভাবের দ্যুতি, 　　সম্বলিত রূপ ভাতি,
　　ভাবুকের চিন্তনীয় ধন।
সদানন্দ প্রেম ধন, 　　এ রূপের এক কণ,
　　অনুভবে প্রীতি অতুলন॥

মনের মানুষ ও কে, 　　আছিস্ আছিস্ ভাই,
　　আয় ছুটে আয় ওরে আয়।

মধুর ভাব-তরঙ্গ, হৃদয়ে করুক্ রঙ্গ,
ডুবে যাই প্রেমের বন্যায় ॥
নব বৃন্দাবন মাঝে, রমণীয় নব সাজে,
এ রূপ ফুটুক্ অন্তরেতে।
নিরুপম রূপ-খনি, মানস-প্রতিমা খানি,
রাখি যেন অতি যতনেতে ॥

শ্রীরসিকলাল দে।

---

# প্রতিদান।

খড়ের ছাউনি পরিষ্কার তকৃতকে ছোট ঘর-খানির রোয়াকের উপর বসিয়া সকালবেলা তামাক টানিতে টানিতে বৃন্দাবন ভাবিতেছিল শৈশবে দুইজন একই অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়া সেই বা কেন দরিদ্র আর দীনবন্ধুই বা কেন ধনী! ছেলেবেলা দু'জনে একসঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, কত মনের কথা কহিয়াছে, কত ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন আঁকিয়াছে, একই রকমে উভয়ে প্রতিপালিত হইয়া এখন তাহার ও দীনবন্ধুর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। ছেলেবেলা দু'জনেই খড়ের গৃহে থাকিয়া এখনও সে সেই খড়ের গৃহেই থাকে, আর দীনবন্ধু ঢেউতোলা বিলাতী টিনের ঘরে সুখে বাস করে। ভগবানের এ কি অবিচার! এই সব ভাবিয়া বৃন্দাবনের মনে দীনবন্ধুর প্রতি প্রবল হিংসা জন্মিয়াছিল। এবং উভয়ের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটি না হইলেও সে কদাপি দীন-বন্ধুর বাটীতে পদার্পণ করিত না ও দীনবন্ধু যদি কোন দিন তাহার বাড়ী আসিত। তবে কোন একটা অছিলা করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িত।

তাই বৃন্দাবন সকালবেলা রাধাকৃষ্ণের নাম ভুলিয়া কেবল তাহার ও দীনবন্ধুর অবস্থার তার-তম্য চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় তাহার চিন্তা ভঙ্গ করিয়া একটী ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্কা সুন্দরী বালিকা বৃন্দাবনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “বাবা! ঘরে চালডাল বাড়ন্ত। এত বেলা হ'লো তবু উনুনে হাঁড়ী উঠ্‌লো না। যাও শীগ্‌গির ক'রে বাজার থেকে সওদা ক'রে এস।”

বৃন্দাবন আপন মনে বলিল, “আমার ঘরে এখনও উনুনে হাঁড়ি চড়েনি, আর তার বাড়ী ছেলেদের সকালবেলাকার ভাতের হাঁড়ী ফুরিয়ে এখন বড় হাঁড়ীর ভাত নাম্‌লো।” এই বলিয়া গায়ে একটি গেঞ্জী দিয়া আটগণ্ডা পয়সা সহ বৃন্দাবন বাজারের দিকে রওনা হইল।

বাজারে যাইতে পথে দীনবন্ধুর বাড়ী পড়ে। দীনবন্ধু বাড়ীর সামনে পথের ধারে একখানি জলচৌকির উপর বসিয়া হুঁকা টানিতেছিল। বৃন্দাবন তাহাকে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া যাই-তেছে এমন সময় দীনবন্ধু বৃন্দাবনকে ডাক দিল। বৃন্দাবন ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরিয়া দাঁড়াইল। দীনবন্ধু বলিলেন, “আমার বাগানে কয়েকটা কপি হ'য়েছে; দু'টো তুই নিয়ে যা।”

বৃন্দাবন মনে মনে রাগে জ্বলিয়া গেল, ভাবিল, “কি! নিজে ধনী, আর আমি দরিদ্র বলিয়া আমাকে এত তাচ্ছিল্য! সামান্য তরকারি কিনিবার সামর্থ্যও কি নাই?” এই

ভাবিয়া মনে করিল যে এই বিষয়ে দীনবন্ধুকে দুটো কথা শুনাইয়া দিবে; কিন্তু দীনবন্ধুর মুখের উপর চাহিয়া সে কিছুই বলিতে পারিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দীনবন্ধু ডাকিলেন, "হ'রে!" "আজ্ঞা" বলিয়া উত্তর লইয়া হ'রে তৎক্ষণাৎ মুনীবের সম্মুখে হাজির হইল। দীনবন্ধু ভৃত্যকে দুইটী কপি লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তাড়াতাড়ি বাগান হইতে দুইটী কপি তুলিয়া আনিয়া হ'রে দীনবন্ধুর সম্মুখে রাখিল। দীনবন্ধু কপি দুইটী বৃন্দাবনের হস্তে দিলেন। বৃন্দাবন মুখে কিছু বলিতে পারিল না; কিন্তু ঘৃণা ও লজ্জায় যেন তাহার সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। কোনক্রমে হস্ত বাড়াইয়া কপি দুইটী তুলিয়া লইয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। বাজারে আসিয়া কপি দুইটী এক দরিদ্রকে দান করিয়া বৃন্দাবন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

চালডাল কিনিয়া বাড়ী ফিরিয়া কাঁধে গামছা ফেলিয়া সে নদীর দিকে রওনা হইল। যথাকালে স্নান সমাপন করিয়া বৃন্দাবন খাইতে বসিল। বৃন্দাবনের স্ত্রী তখন কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "মেয়ে তো বিয়ের যুগ্যি হ'লো, এখন বর খোঁজ।"

বৃন্দাবন বলিল, "হাঁ, তা বরের চেষ্টা তো ক'রছিই, কিন্তু বিয়েতে যে টাকার দরকার। যা কিছু জমিজমা ছিল তা সুকুর বিয়েতেই বিক্রী হ'য়েছে, তারপর তোমার অলঙ্কার ও ঘটিবাটী ভাতো আর বড়র পুঁটির বিয়েতে বন্ধক প'ড়েছে। এখন আর টাকা পাবার উপায় কি?"

বৃন্দাবনের স্ত্রী ইহা বুঝিলেন। আর কোন কথা সে বিষয়ে উল্লেখ করিলেন না।

বৃন্দাবন অনেক বর যাচাই করিল কিন্তু বারশ' টাকার কমে একটীও মিলিল না। এখন বারশ' টাকা তাহার পক্ষে বার কোটী টাকা। এত টাকা সে কোথায় পাইবে? বহু চিন্তার পর বৃন্দাবন যাহার নিকট বাড়ী বন্ধক দিয়াছিল তাহার নিকট যাইয়া বারশত টাকা প্রার্থনা করিল। সে কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না, নানারূপ অছিলা দেখাইতে লাগিল। কিন্তু বৃন্দাবন নাছোড়বান্দা। বহুক্ষণ পরে অনেক অনুনয়-বিনয়ে অগত্যা মহাজন স্বীকৃত হইল ও বিবাহের রাত্রেই টাকা দিবে বলিল।

বৃন্দাবন তাহার আশ্বাস পাইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইল ও মাঘমাসের ১৫ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিল। প্রতি বাড়ী নিমন্ত্রণ করা হইল, কেবল বাদ পড়িল দীনবন্ধু!

আজ বৃন্দাবনের কন্যার বিবাহ। সানাইএর পোঁ পোঁতে কচি ছেলের কাঁদুনিতে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের হট্টগোলে আজ বৃন্দাবনের বাড়ী সরগরম।

অকস্মাৎ এক মহাবিপদ উপস্থিত। বরপক্ষ টাকা চাহিতেছে, কিন্তু বৃন্দাবন যাহার নিকট হইতে টাকা লওয়া ঠিক করিয়াছিল তাহার খোঁজ নাই। বৃন্দাবন চক্ষে অন্ধকার দেখিল, মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

বরপক্ষ তখন বৃন্দাবনের পিতৃকুলের মাতৃকুলের সাত গুষ্টি উদ্ধার করিতে আরম্ভ করিল। গায়ের ঝাল তাহাতেও না মিটিয়া একেবারে সমস্ত গ্রামবাসীদের চৌদ্দ পুরুষের মুখে গুমাখা ঝ্যাটার বাড়ি দিতে লাগিল। গ্রামবাসীগণও ছাড়িবার পাত্র নহে, তাহারা উত্তেজিত হইয়া "মার শালাদের" বলিয়া একেবারে বরকর্ত্তা বরযাত্রী সকলকে বংশদণ্ডের আঘাতে বসুমতী-শায়ী করিতে লাগিল।

এদিকে বৃন্দাবন মাথায় হাত দিয়া উদাসীনের ন্যায় উপবিষ্ট। এমন সময় তাহার সম্মুখে এক প্রশান্ত মূর্ত্তি উপস্থিত হইল, সে বৃন্দাবনের বাল্য-সুহৃদ —দীনবন্ধু।

তাহাকে দেখিয়া বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল— "আমার এই অসময়ে আবার তুমি আমাকে উপহাস করিতে আসিয়াছ ?

ধীরভাবে দীনবন্ধু বলিলেন "উপহাস কর্‌তে আসি নাই বৃন্দাবন ! বাড়ীর ভেতর একবার তোমায় ডাকছে।"

বৃন্দাবন বিরক্তির সহিত অন্দরাভিমুখে চলিল, যাইয়া দেখিল—একি ?

বরবেশী দীনবন্ধুর পুত্রের হস্ত ও তাহার কন্যার হস্ত একত্র করিয়া পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিল—

"মাঘে মাসি শুক্ল পক্ষে—"

আর বাহির হইতে শব্দ আসিতেছিল— "মাথার খুলি উড়িয়ে দে—"

শ্রীমনীষীমোহন রায়।

---

# রাজা নীলাম্বর।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### বিষম বিপদ।

রজনী ভয়ানক অন্ধকার—আকাশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ঢাকা—মধ্যে মধ্যে টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে। একটিও নক্ষত্র নাই। এমন সময়ে রাজা নীলাম্বর চিন্তাকুল হইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে বেড়াইতেছেন। তিনি সংবাদ পাইয়াছেন মুসলমানেরা এই রাজ্য আক্রমণ করিবে, তাই অদ্য শান্তি পাইতেছিলেন না। রাণী নিদ্রিত, তিনি ইহার কোন সংবাদই জানেন না। রাজার অদ্য নিদ্রা নাই, তিনি ভাবিতেছেন কি উপায়ে এই রাজ্য রক্ষা করিবেন। এতকালের হিন্দু-রাজত্ব বোধ হয় এতদিনে শেষ হইতে চলিল। ভগবানের কি ইচ্ছা ? রাজা ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তারপর একটি আসনে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে রাণী চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তিনি দেখিলেন যে রাজা শয্যায় নাই, তারপর ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন রাজা একখানি আসনে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। রাণীর চীৎকারে রাজা সেইদিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, রাণী উঠিয়া রাজার নিকটে গেলেন এবং নিকটে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখছিলেম।" রাজা রাণীর কেশগুলি নিজ হস্তে ছড়াইতে ছড়াইতে বলিলেন—"কি দেখছিলে ? স্বপ্ন কি বিশ্বাস [illegible] স্বপ্নে আবার ভয় কি ?" রাণী [illegible]

"আমি দেখছিলেম আমরা দুজনে পাহাড়ের উপর বেড়াচ্ছি, কত কথাবার্ত্তা বলছি, তুমি আমাকে কত আদর কচ্ছ, আমি যেন তোমার ক্রোড়ে মাথা রেখে আরাম কচ্ছিলেম, এমন সময়ে এক ভীষণ ব্যাঘ্র এসে তোমাকে আক্রমণ কর্‌লে। আমি সে শার্দ্দূলের শব্দে একেবারে অচেতন হ'লেম। কতক্ষণ পরে যখন চৈতন্য হ'ল তখন দেখি একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া অভয় দান কচ্ছেন, শার্দ্দূল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তুমি সন্ন্যাসীর পদতলে ব'সে আছ। আমার যেন স্বপ্নেও ভয় হচ্ছিল, তাই হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।" রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তুমি ঠিক স্বপ্ন দেখেছ, গুরুদেবই আমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা কর্‌বেন। সেই সন্ন্যাসীই আমার গুরুদেব। তাঁহার যতদুর সাধ্য আমাকে ক্রোড়ে রাখবেন, ভগবানের ইচ্ছার উপর কাহারও হাত নাই। তুমি চিন্তা ক'র না। যে ব্যাঘ্র স্বপ্নে দেখেছ, শীঘ্রই সে ব্যাঘ্র এই রাজ্যে আস্‌বে। আমার আবার ভয়ের কারণ কি? তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও।" রাণী বলিলেন—"তুমি ঘুমুচ্ছ না কেন? এত চিন্তার কারণ কি? আমি কি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিনী নই? আমি কি শুধু তোমার সুখের অংশীদার, দুঃখের ভাগ কি গ্রহণ কর্‌বোনা? সেই প্রকৃত স্ত্রী যে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে, স্বামীর সুখ দুঃখের ভাগী হয়। আর কে আস্‌বে? আমাকে কি বল্‌বেনা?" রাজা এত চিন্তার মধ্যেও এইরূপ রাণীর বাক্য শুনিয়া কতকটা শান্তিলাভ করিলেন। তিনি রাণীর বদনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন—সে মুখখানি দীপ্তিব্যঞ্জক উৎসাহ পূর্ণ। তিনি তখন বলিলেন—"তুমি শুন্‌লেই ভয় পাবে।" রাণী তেজপূর্ণ স্বরে উত্তর করিলেন—"রাজার মেয়ে, রাজার স্ত্রী, আমার আবার ভয়? আমি তোমাকে দেখতে দেখতে অনায়াসে প্রাণত্যাগ কর্‌তে পারি। বরং আমাকে ব'লে রাখা ভাল, আমি প্রস্তুত থাক্‌তে পারি।" রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"রাণি! এ রাজ্যের মঙ্গল নাই। আমার মঙ্গলামঙ্গল কি? এত দিনে বুঝি হিন্দুরাজ্য যায়। গৌড়ের বাদশাহ শীঘ্রই এ রাজ্য আক্রমণ করবেন। আমি অবশ্য রাজ্য-রক্ষার চেষ্টায় ক্রটি কর্‌বোনা, কিন্তু শেষ ফল কি হবে ভগবান জানেন। আজকাল মুসলমানদের ভয়ানক তেজ—ভয়ানক ক্ষমতা, তাদের করকবল থেকে রংপুর রক্ষা করা সহজ নহে। তাহাতে আবার অনেক বিশ্বাসঘাতক আমার রাজ্যে জুটেছে, কেহ কেহ মুসলমানদিগকে আমন্ত্রণ ক'রে আন্‌ছে। যে রাজ্যে একতা নাই, যে রাজ্যে বিশ্বাসঘাতকতা, সে রাজ্যের পতন নিশ্চিত; আর হিন্দুরাজ্য রক্ষা পায় না। একে একে সমগ্র ভারতের হিন্দু-রাজাদের পতন হ'য়েছে, এক কোণে এ রাজ্য ছিল, তাই কেহ দৃষ্টি করে নাই। আর আমি আশা পাচ্ছি না, তোমরা প্রস্তুত হও। ভবিতব্যতা খণ্ডায় কাহার সাধ্য?" রাণী সমস্ত শুনিলেন, কিয়ৎ-ক্ষণ পরে উত্তর করিলেন—"স্বামিন্! তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার প্রভু! তোমার মঙ্গলামঙ্গলে আমার মঙ্গলামঙ্গল। আমি কোন বিষয়ই চিন্তা কচ্ছি না। ধর্ম্ম ও তোমার জন্য

অনায়াসে প্রাণত্যাগ করতে পারি, আমার আবার ভয় কি? মুসলমানেরা আমার কি করবে? কিন্তু তুমি এখন থেকে সাবধান হও, স্থানে স্থানে সৈন্য রাখ, দুর্গগুলি রক্ষার বন্দোবস্ত কর, রাজধানী রক্ষার বন্দোবস্ত কর। যাহারা যাহারা তোমার বিশ্বাসী তাহাদিগকে গোপনে ডেকে পরামর্শ কর; আর কালক্ষেপের সময় নাই। তোমার গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে?" রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"না, তিনি কখন দেখা দিবেন জানি না। তবে ব'লেছেন যে বিপদের সময় তিনি আমার নিকটে আসবেন। তিনি কখন কোথায় থাকেন, কি করেন, জানার উপায় নাই। তিনি অন্তর্য্যামি, সব জানেন, কিন্তু আমাকে সব কথা বলেন না।" রাণী বলিলেন—"একবার এ সময় সাক্ষাৎ পেলে উপকার হ'ত।" রাজা হাসিয়া বলিলেন—"তিনি ত আর আমার ইচ্ছা মত আসবেন না, যখন তাঁর ইচ্ছা হবে তখন আসবেন। তবে আদেশ আছে যে বিপদে পড়লে স্মরণ ক'র, আমি যাবো।" রাণী চিন্তা করিয়া বলিলেন "বুঝেছি, তিনি এখন তোমাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। তুমি "ভক্তি" ভুলো না, ভক্তির জোরে তিনি অবশ্যই আসবেন।" রাজা রাণীকে ধরিয়া বসিলেন, উভয়ের মুখে অনেকক্ষণ কথা নাই। সম্মুখের বাতায়ন খোলা, উদ্যানের কুসুম সৌরভ নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। গৃহে ঝাড় জ্বলিতেছে অতএব কোন স্থানে অন্ধকার নাই। রাণী বলিলেন—"এস, এখন নিদ্রা যাও, নতুবা শরীর নষ্ট হবে।" এই কথা বলা মাত্রই "গুড়ুম" করিয়া একটি শব্দ হইল, একটা গুলি আসিয়া রাণীর বাম হস্তে বিদ্ধ হইল, রাণী বাম হস্তে এই সময়ে রাজাকে জড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। রাণী একেবারে অচেতন হইলেন, রাজা তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া শয্যায় শয়ন করাইলেন। গোলমালে ভৃত্যগণ ও দাসীগণ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল, তাহারা তখনই শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। তখনই চিকিৎসক ডাকা হইল, কিন্তু আততায়ীর আর অনুসন্ধান হইল না।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### পরামর্শ।

রাণী মলয়াবতী অচেতন হইলে ভুবনেশ্বরী আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। রাজা অদূরে একখানি আসনে বসিয়া দেখিতেছিলেন। চিকিৎসক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, ঘন ঘন সেই ঔষধ সেবন করান হইতেছে। নানারূপ যত্নে ও শুশ্রূষায় রাণীর চৈতন্য হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়াই রাজার দিকে দৃষ্টি করি-লেন। কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না। চিকিৎসক গুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন, অতএব তত আশঙ্কার কারণ ছিল না। ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বেদনার অনেক উপশম হইয়া-ছিল। রাণী একবার ভুবনেশ্বরীর দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন ভুবনেশ্বরী বড় দুঃখিতা। এ সময়ে পিস্তল অধিক প্রচলিত ছিল না, মুঙ্গেরে অবশ্য বন্দুক, পিস্তল ও কামান প্রস্তুত হইত, সেগুলি প্রায়ই দিল্লীতে যাইত,

তবে বঙ্গেশ্বরের অস্ত্রাদিও তথায় নির্ম্মিত হইত। রংপুর রাজ্যে পিস্তলের প্রচলন ছিল না। ইহাতেই রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তবে নিশ্চয়ই মুসলমানেরা রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহাকেই বধ করার উদ্দেশ্য ছিল, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। ঘটনা-চক্রে তাঁহার গাত্রে গুলি না লাগিয়া রাণীর গাত্রে লাগিয়াছে। তিনি এই ঘটনাতে বড় চিন্তিত হইলেন। রজনীযোগে তিনি মন্ত্রী-দিগের সঙ্গে পরামর্শে বসিলেন। হংসেশ্বর বলিলেন—আমার বিশ্বাস মুসলমানেরা এই রাজ্যে প্রবেশ করেছে, আমি একদিন তাহা-দিগকে পরামর্শ কর্‌তে দেখেছি।"

রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"এতদিন বল নাই কেন?" হংসেশ্বর বলিলেন—"আমি কোন ভয়ের কারণ দেখি নাই, বিশেষতঃ এ রাজ্যে মুসলমানেরা সহজে কি করবে, অনর্থক আপনাকে ও রাজ্যের সকলকে উদ্বিগ্ন হইতে দেওয়ায় প্রয়োজন কি?" রাজা বলিলেন—"তোমার বলা উচিত ছিল, পূর্ব্বে জানালে সতর্ক হওয়া যেত ও রাণীর এ অবস্থা হ'ত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহারা সহজে অন্তঃপুরের উদ্যানে প্রবেশ করলে, ও স্বকার্য্য সাধন ক'রে পলায়ন করলে। রাজ্যের এত সৈন্য, প্রহরী, কর্ম্মচারী, কেহই তাহাদের অনুসন্ধান করতে পারলে না! নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র চলছে, হয় ত, মুসলমানদের সঙ্গে যোগদান করতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন না। আমাদের মন্ত্রী যে কোথায় গেলেন, তাহা কি আপনারা বুঝতে পেয়েছেন? নিশ্চয়ই জানবেন যে যখন দুই একটী লোকের সমাগম হ'য়েছে তখন অসংখ্য মুসলমান সৈন্য শীঘ্রই এ রাজ্য আক্রমণ করবে, আপনারা প্রস্তুত হন। যদি অপ্রস্তুত থাকেন, তবে তাহার ফল অচিরাৎ দেখতে পাবেন।" সভাসদেরা সব চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন, একজন বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"মহারাজ যা বলছেন সব ঠিক, আমাদের দুর্গ সুদৃঢ়, সৈন্য সুশিক্ষিত, অস্ত্র শস্ত্রও পরীক্ষিত, সহজে যে শত্রু রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে আমার বোধ হয় না। তবে আমাদের প্রথম হ'তেই সাবধান হওয়া দরকার। চারিদিকে গুপ্তচর পাঠান কর্ত্তব্য, আর রাজ্য মধ্যে বিশ্বাস-ঘাতক কেহ আছে কি না তাহা দেখা কর্ত্তব্য।" তিনি স্বআসনে উপবেশন করিলেন। একজন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"আমাদের এক্ষণ কি কর্ত্তব্য? রংপুর হিন্দুরাজ্য, এরাজ্য রক্ষা করাই চাই। নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করি-লেও রাজ্য রক্ষা প্রয়োজন। আমার মতে রাজ-ধানী রক্ষার ভার হংসেশ্বর রায়ের উপর অর্পিত হউক; হংসেশ্বর রায় বিশ্বাসী, তেজস্বী, ও সাহসী। এরূপ সেনাপতি পাওয়া কঠিন। যদি উপযুক্ত পাত্রের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার অর্পিত হয়, তবে আর কোন ভয়ের কারণ থাকবে না।" রাজা অন্যান্য সভাসদের দিকে দৃষ্টি করিলেন, সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তখন রাজা হংসেশ্বর রায়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ভাই! তোমাকে আমি চিরদিন বন্ধুভাবে দেখি, কর্ম্মচারীর ন্যায় দেখি না, এইবার সে ভাবের পরিচয় দেও। রাজ-ধানী রক্ষার ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইল,

তুমি যেরূপ ভাল বুঝবে সেইরূপ বন্দোবস্ত করবে, আমি তোমার উপর সম্পূর্ণ ভারার্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লেম।" হংসেশ্বর অবনত বদনে রাজাদেশ শ্রবণ করিলেন, তারপর বলিলেন—"মহারাজার আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু আমি তেমন উপযুক্ত পাত্র নই। যাহা হউক, মহারাজার আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করবো। আমি অদ্য থেকেই সব বন্দোবস্ত আরম্ভ করবো। আপনি এক্ষণ মহারাণীর শুশ্রূষার দিকে দৃষ্টি রাখুন। সভাসদগণ আপনারা সকলেই দয়া ক'রে আমাকে মনোনীত করলেন,আশা করি আপনাদের বিশ্বাস অপাত্রে অর্পিত হবে না। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ চেষ্টার ত্রুটি হবে না।" সকলেই তখন তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল, রাজা উঠিয়া হংসেশ্বরকে আলিঙ্গন ক...

# পঞ্চম খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### নগরের উপকণ্ঠে।

রজনী অদ্য ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে, যেন কোন ভীষণ কার্য্যের সহায়তাকল্পে এরূপ বেশ হইয়াছে। একে দ্বিপ্রহর অতীত তাহাতে আকাশ মেঘে ঢাকা—এবং অমাবস্যা অদ্য রজনীর সাহায্যকারিণী—তাই যেন রাক্ষসীর ন্যায় মুখব্যাদন করিয়া সমস্ত জীবকুলকে খাইতে উদ্যত। এক একবার সৌদামিনী এ দৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া পলাইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে গভীর গর্জ্জন প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। জীবজন্তু কেহই ঘরের বাহির হইতেছে না, কেবল হিংস্র প্রাণীগণ মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে। রংপুর সহরের লোক সকলেই প্রায় নিদ্রিত, সহরটি প্রাচীরে বেষ্টিত, চারিদিকে চারিটি প্রধান দ্বার, দ্বারে সমগ্র প্রহরী দণ্ডায়মান। হংসেশ্বর রায় সহরের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি এই সব দ্বারে সুশিক্ষিত সৈন্য সমবেত করিয়া রাখিয়াছেন যেন যবনেরা হঠাৎ প্রবেশ করিতে না পারে। সহরের বাহিরে অনেক লোকের বসতি, তাহারা সভয়ে বাস করিতেছে, তাহারা শুনিয়াছে যে গৌড়ের সৈন্য শীঘ্রই এ স্থানে আসিবে। এ হিন্দু-রাজ্যে এত কাল এ সব উপদ্রব ছিল না, তাই নির্ভয়ে তাহারা বাস করিতেছিল, এক্ষণ হঠাৎ আশঙ্কার কারণ জানিয়া তাহারা ভীত হইয়া দিনযাপন করিতেছে। তাহাদের বাড়ীর একক্রোশ দক্ষিণে ভীষণ বন, তথায় ব্যাঘ্র ভল্লুকের বসতি, দিনে দরিদ্র লোকেরা তথায় কাষ্ঠ সংগ্রহে যায়, কেহ কেহ বা মধু—কেহ কেহ বা ফল সংগ্রহে যায়—কিন্তু রাত্রিতে কেহ সেদিকে যায় না।

হংসেশ্বর অদ্য স্বয়ং চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতেছেন প্রহরীরা সজাগ কি না। সকলেই হংসেশ্বর রায়কে ভয় ও ভক্তি করিত, তাই তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিত।

ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, প্রহরীরা বাহিরে আর থাকিতে না পারিয়া ঘরের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময়ে একটি যুবক কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হইল। প্রহরীরা সে সময় দ্বার বন্ধ করিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার

জন্য আশ্রয় লইয়াছিল,যুবককে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে ?" যুবক কোন কথা না বলিয়া একটি বিচিত্র স্বর্ণ অঙ্গুরী দেখাইল. তখনই প্রহরীবা দ্বার খুলিয়া দিল, যুবক বাহির হইয়া গেল।

হংসেশ্বর রায় ইহার কিছুক্ষণ পরেই সেই স্থানে আসিলে প্রহরীবা উপরোক্ত যুবকের ঘটনা বলিল। হংসেশ্বর রায় শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরী কোথায় পাইল ? তিনি এ বিষয় অনুসন্ধান করিবেন—স্থির করিলেন।

যুবক ফটকের বাহির হইয়াই এদিক ওদিক দৃষ্টি করিল, তারপর বনের দিকে চলিল। এক স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পাদপে আচ্ছন্ন ছিল, সেস্থানটি ভয়ানক অন্ধকার, যুবক অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

বনের মধ্যে একটি বহুকালের পুরাতন পুষ্করিণী, তাহার চারিদিকে বড় বড় গাছ—অতএব দিনেও অন্ধকারময়। একটি ভগ্ন ইষ্টকালয় পূর্ব্বপার্শ্বে বিরাজ করিতেছে। ঐ ইষ্টকালয়ে একটি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। ইষ্টকালয়ের সম্মুখ ভাগে একটী বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া বহু যুগের পরিচয় দিতেছে। এই অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সকলেই নিস্তব্ধ। রজনীর নীরবতা ভঙ্গ হইতেছে না। আলোকের নিকট ছয়টি লোক বসিয়া চুপে চুপে কথা বলিতেছেন। একজন বলিলেন—"তার পর কি কর্ত্তব্য ?" অপর ব্যক্তি উত্তর করিলেন—"জাহাপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয়।" গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ স্বয়ং উপস্থিত, সঙ্গে মন্ত্রী শচীপাত্র। তিনি উহাকে ছাড়িয়া দেন নাই, একেবারে সঙ্গে সঙ্গে রংপুর লইয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে বহু সুশিক্ষিত সৈন্য, ইহারা এই ভীষণ অরণ্যের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সৈন্যেরা বনের চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। পর দিবস প্রত্যুষে রাজধানী আক্রমণ করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায়, ও সেইজন্য সভাসদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক্ষণে মন্ত্রীর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিতেছেন। ইহারা ঘোড়াঘাট দুর্গের রাস্তায় আসেন নাই, অপর দিক দিয়া এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

গৌড়েশ্বর বলিলেন—"তা হ'লে ভোরেই আক্রমণ পরামর্শ। আপনি আমাদের বুদ্ধিদাতা, আপনার পরামর্শ মতই এতদূর এসেছি। আপনি কি ঠিক জানেন,অধিক সংখ্যক সৈন্য রাজধানীতে নাই ?" মন্ত্রী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"হুজুর! আমার এ বিষয় বেশ জানা আছে। যে সব সৈন্য উপস্থিত আছে, আপনার সুশিক্ষিত সৈন্যের নিকট তারা দাঁড়াতে পার্‌বে না। আপনার জয় অনিবার্য্য। আপনি দেখতে পাবেন এত সহজে রাজ্যজয় কোথাও হয় নাই। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" গৌড়েশ্বর হাসিয়া বলিলেন—"এইবার আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, এই রাজ্য আপনাকে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।" মন্ত্রী এই আশ্বাসবাক্যে বড়ই আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"হুজুর যার সহায়, তার আবার ভাবনা কিসের ?" গৌড়েশ্বর বলিলেন—"আপনি

আমার দক্ষিণ হস্ত, আপনার সহায়তা ব্যতীত আমি কিছুই কর্‌তে পারতেম না।" এই সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া বলিল—যে জনৈক যুবক সাক্ষাতপ্রার্থী। অনুমতি হইতেই তাহাকে আনয়ন করা হইল। যুবক আসিয়া অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। গৌড়েশ্বর বলিলেন—"তুমি কে? কি চাও?" যুবক নির্ভিকচিত্তে উত্তর করিল—"আমি জাহাপনাকে সাহায্য কর্‌তে এসেছি।" গৌড়েশ্বর বলিলেন "আমি যে এখানে এসেছি তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?" যুবক হাসিয়া উত্তর করিল—"হোসেন আলি আমাকে বিশেষ জানে। আমিই তাহার দ্বারা রাজা নীলাম্বরকে বধ করার চেষ্টায় ছিলেম।" তখন বাদশাহ বলিলেন—"হাঁ, স্মরণ হয়েছে, তোমার কথা আমি শুনেছি। এখন কি চাও?" যুবক বলিল—"আমি রাজাকে ধরায়ে দিব। কাল ভোরে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ক, আমি কৌশলে তাঁকে আপনার হাতে দিব। আমি এখন বিদায় হই, স্মরণ রাখবেন।" এই বলিয়া চকিতের ন্যায় যুবক চলিয়া গেল, উহার ব্যবহারে বাদশাহ ও মন্ত্রী উভয়ই অবাক হইলেন। বাদশাহ তখনই একজন সৈনিককে যুবকের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল, যুবক যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা আর কেহ নির্ণয় করিতে পারিল না। বাদশাহ মন্ত্রীকে বলিলেন—"এ যুবককে চিনেন কি? এ কি রাজবাটী সংক্রান্ত?" মন্ত্রী বলিলেন—"না হুজুর, আমার পরিচিত নহে, তবে মুখখানা যেন চেনা চেনা বোধ হইতেছে, বোধ হয় কোথায় দেখিয়া থাকিব।" বাদশাহের বদনে একটু চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল।

ইহার পর গৌড়েশ্বর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। কি প্রকারে আক্রমণ করিতে হইবে, শত্রুপক্ষের কত সৈন্য, তাঁহার সৈন্য দাঁড়াইবে কোথায়, কি প্রকারে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিতে হইবে, কোন্ দ্বারে কত সৈন্য আছে, কোন্ দ্বারে আক্রমণ করিবে। এই সব পরামর্শ ঠিক হইলে প্রধান সেনাপতিকে ডাকিলেন, তাহার সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ হইল। সেনাপতি বলিলেন—"খোদাবন্দ! আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাওয়া কি প্রয়োজন? গোলাম থাক্‌তে হুজুরের কষ্ট করায় কি আবশ্যক?" বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার গুণের আমি সর্ব্বদা প্রশংসা করি, কাল তোমার কার্য্যের বিচার হবে. আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকবো, কোন চিন্তা ক'রনা। জয় করা চাই।" সেনাপতি বলিল "হুজুর! সে বিষয় চিন্তা নাই, এদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি?" এই বলিয়া সেনাপতি অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### যুদ্ধের পূর্ব্ব রজনী।

রাজান্তঃপুরে একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া রাজা ও রাণী কথোপকথনে নিযুক্ত। উভয়েরই চিন্তাক্লিষ্ট বদন। রাজা বলিলেন—"রাণি! বলিতে পারি না এ যুদ্ধের পরিণাম কি। গুরুদেবের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। যদি [illegible] বেঁচে থাকি তবে দেখা হবে, নতুবা [illegible] রজনীতেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। [illegible]

যদি মৃত্যু হয়, তবে তোমার গতি কি হবে তাই ভাবছি।" রাণী অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন —"আমার সে বিষয়ে কোন ভয় নাই। তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা, তুমি আমার স্বামী, আমার সর্ব্বস্ব ধন। যদি তোমাকেই হারাই তবে ত আমার সবই গেল। স্ত্রীলোকের স্বামীই পরম ধন, স্বামী গেলে আবার তাহার থাকে কি? আমরা সতীত্ব রক্ষা কর্তে জানি, যদি এ রাজ্যের পতনই হয়, তখন জগতের জীব দেখবে হিন্দু-ললনা কেমন ক'রে সতীত্ব রক্ষা করে, কেমন ক'রে আত্মমর্য্যাদা রাখে। আমরা অনায়াসে প্রাণ দিতে জানি, আমাদের নিকট প্রাণের মমতা নাই। বাঙ্গালী রমণী ব'লে কি আমাদের তেজ নাই? লোকে দেখ্‌বে বাঙ্গালী পুরুষের কেমন বাহুবল, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের কেমন মনের বল। স্বামিন্! প্রভো! এ বিষয় কোন চিন্তা ক'র না, যদি ভগবানের অন্য রূপ ইচ্ছাই হয়, তবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে অনায়াসে যেতে পার্‌বো।" এত কষ্টে ও চিন্তাতেও রাজার মুখ আজ প্রফুল্ল হইল, তিনি আদর করিয়া রাণীর গণ্ডস্থলে একটি চুম্বন করিলেন। রাণী বলিলেন—"আগামী কল্য যাহাতে যুদ্ধে জয় হয় তাই কর্‌বে, হিন্দুর অস্ত্র-শিক্ষা যেন সফল হয়, দয়াময় হরি তোমাদের মঙ্গল করুন। শুনেছি অনেক বিশ্বাসঘাতক এই রাজ্যের অমঙ্গল চিন্তা কচ্ছে ও স্বপ্ন দেখছি তাহাদের সে চিন্তা যেন বৃথা হয়। তুমি বীর-পুরুষ, বীরের [illegible], বীরের ন্যায় ব্যবহার কর্‌বে।" রাজা এই সব বাক্যে বড় উৎসাহিত হইলেন, তিনি বলিলেন—"রাণি! তোমার উত্তেজনায় আজ আমার চিন্তা দূর হ'ল, কাল শুন্‌তে পাবে তোমার স্বামী অযোগ্য রাজা নয়। কেমন একটা চিন্তায় আমি অস্থির হ'য়েছি, এ বিপদ সময়ে গুরুদেব কোথায় থাক্‌লেন। তিনি বলেছিলেন—তোমার বিপদে আমি উপস্থিত হব, এমন বিপদেও তিনি আস্‌ছেন না। ইহার অর্থ কি বুঝতে পাচ্ছি না।" রাণী বলিলেন—"তিনি হয় ত ঠিক সময় মত আস্‌বেন। তিনি তোমাকে সন্তান অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, তিনি কি এ সময় নিশ্চিন্ত থাকতে পার্‌বেন?" রাজা নীলাম্বর এ কথায় আর উত্তর করিলেন না। রাণী বলিলেন—"স্বামিন্! আজ একটু নিদ্রা গেলে হয় না?" রাজা উত্তর করিলেন—"আজ নিদ্রার অবসর কই? এমন সময়ে একজন দাসী আসিয়া বলিল—"হংসেশ্বর রায় সাক্ষাত-প্রার্থী, বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ।" রাজা রাণীকে বসিতে বলিয়া মন্ত্রণাগারে আসিলেন, তথায় হংসেশ্বর রায় একাকী বসিয়াছিলেন। রাজা প্রবেশ করিতেই তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন করিলেন। রাজা বলিলেন—"কি খবর?" হংসেশ্বর বলিলেন—"আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী কি কাহাকেও দিয়াছেন?" রাজা অবাক হইয়া উত্তর করিলেন "না," তারপর নিজের অঙ্গুলী দেখিলেন, তথায় অঙ্গুরী নাই। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।" হংসেশ্বর বলিলেন—"অঙ্গুরী চুরি হ'য়েছে। একজন লোক সেই অঙ্গুরী সাহায্যে রজনীতে সহরের বাহিরে গিয়াছে। আমি এখনই হুকুম দিব যে কাহাকেও

অন্ধ রজনীতে বাহির হ'তে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়। রাজান্তঃপুর হ'তে কি ভাবে যে অঙ্গুরী গেল, তাহা বুঝতে পাচ্ছি না।" রাজা বলিলেন "বোধ হয় আমার নিদ্রিতাবস্থায় কেহ খুলে নিয়েছে, অথবা কোন রকমে প'ড়ে গিয়াছিল, কুড়ায়ে নিয়াছে। তুমি শীঘ্র এ বিষয়ে কড়া হুকুম দেও।" হংসেশ্বর রায় বাহির হইয়া গেলেন, তিনি বাহির হওয়া মাত্র সহরের প্রতি দ্বারে গিয়া হুকুম দিলেন যে রাজ-নামাঙ্কিত অঙ্গুরীতে কেহ আর বাহিরে যাইতে বা বাহির হইতে আসিতে পারিবে না। পূর্ব্ব দ্বারে যাইয়া এই হুকুম দেওয়া মাত্র প্রহরীগণ বলিল যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই একজন যুবক বাহির হইতে সহরে ঐ অঙ্গুরীর বলে প্রবেশ করিয়াছে, হংসেশ্বর রায় বড় বিরক্ত হইলেন, তিনি রাজ-বাটী গিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, এই অবসরে যুবক তাহার কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে কেন এই হুকুম জারি করেন নাই, কেন যে রাজার জন্য অপেক্ষা করিলেন, এক্ষণে সে বিষয়ের অনুতাপ হইল। কিন্তু আর উপায় নাই, তবে ভবিষ্যতের বিপদ সম্ভাবনা নাই, এই বলিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

---

## পাগলির স্মৃতি।

১

সেই কথা পাগলিরে সুধায়োনা আর বার,
যে কথা সুধা'লে পরে,
নয়নে সলিল ঝরে,
নীরব প্রাণের মাঝে জেগে ওঠে হাহাকার,
যে কথা পশিলে কাণে,
তড়িৎ চমকে প্রাণে,
হৃদয় শুখায়ে ওঠে—হেরি সব অন্ধকার;
সেই কথা পাগলিরে সুধায়োনা বার বার।

২

বাল্যের সে মুখখানি আজি বড় মনে নাই,—
সেই স্মৃতি নিশি দিন
জাগিয়া, জাগিয়া ক্ষীণ
হ'য়ে গেছে,—কোনখানে খুঁজিলেও নাহি পাই;
কবে তার পদ মূলে,
নীরবে আপনা ভুলে,
ঢেলেছি নয়ন ধারা ব'সে ব'সে ভাবি তাই;
পুরাণ' সে ছবিখানি ভেঙ্গে চুরে ঠাঁই, ঠাঁই।

৩

বারেক পরশে যার হৃদয়ে বাজিত সুর,
হৃদি কুঞ্জ মঞ্জুরিত,
কোকিল কাকলি দিত,
আবেশে কাঁপিত হিয়া,—মুগ্ধ প্রাণ ভরপুর,—
মলয় ভরিত দিশি,
জ্যোৎস্নাময় হ'ত নিশি,
তটিনী নাচিয়া উঠি ছুটিত অনেক দূর;
মরমে বাঁশীর তানে বাজিত জংলা সুর।

৪

তিলেক দরশ' বিনা হ'তাম বিবশ প্রায়,
আঁখি দুটী জলে ভরা,
আঁধার হইত ধরা,
বহিত কালিন্দি বন্যা ক্ষুদ্র হৃদি যমুনায়;
নির্ভিত দিনের আলো,
আকাশ হইত কালো,
সাধের আরাম-বাগ হইত মরুর প্রায়,

ঝুরিত পিঞ্জরে পাখী, নূপুর কাঁদিত পায়।

৫

একটী চুম্বনে যার শিথিল হইত প্রাণ,
কবরী আকুল কেশা,
জমিত গোলাপী নেশা,
অলস আঁখির 'পরে নাচিত কামের বাণ,
বেহাগে বাজিত বেণু,
শিহরি উঠিত তনু,
পূর্ণিমা শিয়রে জাগি অমৃতে করা'ত স্নান ;
সে শুভ মুহূর্ত্তে হ'ত কত যুগ অবসান।

৬

কত দিন গেছে ব'য়ে, নাহি বুঝি মনে আর,
এবে, সে নাম পশিলে কাণে,
তড়িৎ চমকে প্রাণে,
নীরব প্রাণের মাঝে জেগে ওঠে হাহাকার ;
অমনি গোপনে থা'ক,
গোপনে নিভিয়া যা'ক,
নীরবে শুখা'য়ে যাবে নয়নে সলিল ধার,
সেই কথা পাগলিরে সুধায়োনা বার বার।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী।

---

## সকলে সমান নয়।

কেহ ছোট কেহ বড়, জগতী ভিতরে।
সকলে সমান নয়, খ্যাত চরাচরে॥
কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ দ্বারবান।
কেহ বা কৃপণ শঢ়, কেহ করে দান॥
কেহ ধনী কেহ দীন, কেহ চাষ করে।
দিন খাটে দিন খায়, কোন কোন নরে॥
কেহ বা অন্নের লাগি, ফেরে দেশে দেশে।
সুখেতে কাটায় কাল, কেহ ঘরে বসে॥
কেহ বা আদেশ করে, কেহ তাহা পালে।
কেহ খাটে নিদ্রা যায়, কেহ বা ভূতলে॥
কেহ বা পৈতৃক ধন, সুখে বসে খায়।
কেহ বা বঞ্চিত, নাহি কাণা কড়ি পায়॥
কেহ রাজমন্ত্রী পদে, হয প্রতিষ্ঠিত।
কেহ ভৃত্য ভাবে, তার চরণে লুণ্ঠিত॥
সেনাপতি হয়ে কেহ, যুদ্ধ যাত্রা করে।
ভীত হয়ে কেহ থাকে, লুকাইয়া ঘরে॥
কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেহ নাচে গায়।
ডা'ল ভাত খেয়ে কেহ, পড়ে ঘুম যায়॥
রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত, কেহ বুদ্ধি বলে।
কেহ সুখে থাকে, কার দিন নাহি চলে॥
কেহ মূর্খ কেহ জ্ঞানী, কেহ পূজা পায়।
বুদ্ধি দোষে মার খেয়ে, কেহবা পলায়॥
সকলে সমান দয়া, ঈশ্বরের বটে।—
বুদ্ধি চেষ্টা ভেদাভেদে, এই সব ঘটে॥
সকলে সমান নয়, তাই কবি কহে।
চেষ্টায় সকল হয়, কভু মিথ্যা নহে॥
মানুষে করেছে যাহা, মানুষে তা পারে।
চেষ্টার অসাধ্য কিবা, আছে এসংসারে॥

শ্রীভগবান চন্দ্র ভূতি।

---

## ভারতের অধোগতি কেন?

ভারত অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য-দেশ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যে সময়ে অসভ্যতান্ধকারে আচ্ছন্ন, সে সময় ভারত সভ্যতা আলোকে আলোকময়। কোন কোন

প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন—অধুনাতন সময়ে ভারত ও মিসরের মধ্যে যে গভীর সাগর পরিদৃষ্ট হয়, অতি পুরাকালে তাহা ছিল না। ভারত ও মিসর ভূখণ্ড দ্বারা সংলগ্ন ছিল।

অতীত ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ইহার তমোময় গভীর গহ্বরে কত বিষয় ও কত তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, তাহা বলা যায় না। এই সামান্য তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া মানব-জ্ঞান এক্ষণে পরিসর ও বিস্তার লাভ করিয়াছে,—তদপেক্ষা অধিক তত্ত্ব অবগত হইলে যে ইহাপেক্ষা অধিকতর পরিসর ও বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতীতের ঘোর তমোরাশি দুর করিবার উপায়, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান। পূর্ব্বে এখানকার ন্যায় ইতিহাস ছিল না। প্রত্ন-তত্ত্ব অনুসন্ধান আধুনিক আবিষ্কার। ইতিহাস দ্বারা ভূতকালের যে সত্যের আলোক প্রভাসিত হয়, প্রত্ন-তত্ত্ব অনুসন্ধানে যদিও সেরূপ আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি অনেক তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। তাহা হইলেও কোন দেশের প্রাচীন সময়ের অবস্থা তদ্দ্বারা বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

অতি পুরাকালে ভারতের অধিকাংশ স্থান বনাবৃত ছিল। সেই বনমধ্যে পর্ব্বতমালা উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায় মান ছিল। তাহাদিগের সানুদেশ, উপত্যকা ও অধিত্যকা এবং এমন কি শিখরদেশ পর্য্যন্ত ঘোর অরণ্যময় ছিল। বেগবতী স্রোতস্বতী সমূহ সেই বন মধ্য দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইত। তাহাদিগের তটস্থলও পরিষ্কৃত ছিল না, ঘোর গহন বনে আবৃত ছিল। সেই সব বনে অগণ্য বন্য জন্তু সমূহ বিচরণ করিত। অসংখ্য মৃগ, বন্য গাভী, মহিষ, বনবরাহ, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি তৃণভোজী ও হিংস্রক ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুরা নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিত। সেই সব অটবীর বিটপীশাখে নানাবিধ পক্ষী মধুর রবে গান করিত। সেই প্রাচীন সময়ে হিমালয় বক্র রূপে স্বীয় তুষার মণ্ডিত মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক অধুনাতন সময়ের ন্যায় এসিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহ হইতে ভারতকে পৃথক করিত। এখনও ভারতবক্ষে যে সকল নদ-নদী বহিয়া যাইতেছে, তখনও সেই সব নদ-নদী তথায় প্রবাহিত হইত কি না, কে বলিবে? তখন এখনকার অপেক্ষা অধিক নদ-নদী ছিল কি না তাহাই বা কে বলিবে। পূর্ব্ব অপেক্ষা ভারতে নদ-নদীর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, তাহা দেখা যাইতেছে। সেই দূরবর্ত্তী অতীতকালে ভারত কেবল বন্য জন্তু ও পক্ষীকুল পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেই ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্বে ভারতে মনুষ্যের বাস ছিল। এই সব বনে অনেক অনার্য্য জাতি বাস করিত। ইহারা অতিশয় অসভ্য ছিল। তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিত না। ভূগর্ভে গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক বা গিরি গুহায় পশুদিগের ন্যায় বাস করিত। তাহারা সর্ব্বপ্রকার পশুদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। পশুর ন্যায় জন্তু বধ করিয়া তাহাদিগের আম' মাংস ভক্ষণ করিত এবং উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত। ধাতুর ব্যবহারে ও কৃষি কার্য্যে অজ্ঞ ছিল। তাহারা পশুবৎ [illegible]

যাপন করিত। অগ্নির দ্বারা ভক্ষ্য বস্তু সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে জানিত না। লবণের ব্যবহারে অভিজ্ঞতা ছিল না। আহার অন্বেষণ ব্যতীত তাহাদিগের আর কোন কার্য্য ছিল না। ভারতের পরম রমণীয়া প্রকৃতি শোভা অবলোকন করিয়া তাহাদিগের মনে আনন্দ বা বিস্ময় বা আশ্চর্য্যের ভাব উদয় হইত কি না, কে বলিবে? যদি স্বভাবের শোভা দেখিয়া পশুরা মুগ্ধ হয়, তবে তাহারাও হইত। পশুদিগের সহিত তাহাদের বিশেষ প্রভেদ ছিল না বলিয়া—একথা বলিলাম।

ভারতে আদিম নিবাসীগণের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। এই জাতির জাতীয় বংশ বর্ত্তমান সময়ে ভারতে আছে কিম্বা সেই জাতি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বা ভারতে পরে যে সব অসভ্য জাতি আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু স্থির করিয়া বলা যায় না। এই জাতি বহুকাল তথায় বাস করিলে পর মধ্য এশিয়া হইতে ভারতের উত্তরপূর্ব্ব পার্ব্বত্য পথ অতিক্রমপূর্ব্বক দুই অসভ্য জাতি ক্রমে ক্রমে ভারতে আসিয়া বাস করে। প্রথমতঃ যে জাতি আসে, সেই জাতির নাম তিব্বতীয় বুরমান ছিল। তৎপরে যে জাতি আসে, ইহার নাম কোলারিণ। যদিও এই দুই জাতি ভারতের আদিম নিবাসীগণ অপেক্ষা সভ্য ছিল, তথাপি তাহারা লৌহের ব্যবহারে অজ্ঞ ছিল এবং তাহাদিগের পশু পালনে অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তবু তাহারা কৃষিকার্য্য করিতে জানিত। তাহাদিগের সময় ভারতে কৃষিকার্য্যের প্রারম্ভ হয়। তাহারা লৌহের ব্যবহার জানিত না ও তাহাদিগের পালিত পশু ছিল না, তবে কি প্রকারে তাহারা কৃষিকার্য্য করিত ইহা বুঝা দুষ্কর। বনাবৃত ভারতের অনেকস্থল তাহাদিগের সময়ে পরিষ্কৃত হয়। এবং তাহাদিগের সময়ে ভারতে গ্রাম ও পল্লী সংস্থাপনের সূত্রপাত হয়। তিব্বতীয় বুরমান জাতি মোগল জাতীয় ছিল। এই জাতি হইতে নানাজাতির উদ্ভব হয়। অধুনাতন কুকি, নাগা, লোচা, ভুটিয়া প্রভৃতি জাতি উক্ত জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কোলারিণেরা এখানকার সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষ। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত উক্ত জাতিত্রয়ের নিবাসভূমি ছিল। পরে ইহারা উত্তর পশ্চিম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া তথায় আর এক জাতি উপনীত হইয়াছিল। এই জাতি পূর্ব্বোক্ত জাতিত্রয়ের অপেক্ষা সভ্য ছিল। তাহারা আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করে, পরে তথা হইতে ভারতের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে গমনপূর্ব্বক অধিবাস করে। কৃষি কার্য্যে ও পশু পালনে ইহারা বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। ইহাদিগের সময় ভারতের অনেক স্থান পরিষ্কৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত তিব্বতীয় বুরমান ও কোলারিণ জাতিদ্বয়ের দ্বারা ভারতে গ্রাম সংস্থাপনের কেবলমাত্র সূত্রপাত হইয়াছিল, ইহাদের সময় তথায় গ্রাম ও পল্লী সংস্থাপিত হইয়াছিল। শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য ইহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিত। ইহারা আপনাদিগের মধ্যে একজনকে রাজা স্বীকার পূর্ব্বক তাহার শাসনাধীন হইত। দাক্ষিণাত্যে সে সব লোক এক্ষণে তামিল,

তেলিগু, কানারিজ ও মালয় ভাষায় কথা কহিয়া থাকে, উক্ত জাতি হইতে তাহাদিগের উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত জাতিরা ধর্ম্ম কাকে বলে জানিত না, ইহাদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-যাজন ছিল। পৃথিবী সর্পাকারে গঠিত হইয়া তাহাদিগের উপাস্য দেবতা ছিল। এই জাতির নাম দ্রাবিদিয়ান ছিল।

এই সময়ের বহুকাল পরে উক্ত পথ দিয়া আর এক জাতি ভারতে আগমন করিয়া বাস করে। এই জাতি মধ্য এশিয়া হইতে ভারতে আগমন করেন, অনেক ইতিহাসবেত্তা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মত তত যুক্তিমূলক বলিয়া বোধ হয় না। মধ্য এশিয়া মোগল জাতির আবাস ভূমি। কিন্তু যে জাতি ভারতে শেষ আসিয়াছিল, ইহারা যে মোগলজাতীয় নহে তাহাদিগের গঠনপ্রণালী, মুখশ্রী প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয়।

আকার, গঠন-প্রণালী ও বর্ণনানুসারে মানবজাতিকে স্বাভাবিকভাবে পঞ্চ জাতিতে বিভাগ করা হয়, যথা ককেসিয়ান, মোগল, মালোয়ান, নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ান এই পঞ্চজাতির মধ্যে ককেসিয়ান জাতি শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের আকার ও গঠন প্রণালী ও মুখশ্রী সুন্দর ও ইহাদিগের বর্ণ-গৌর। উক্ত জাতি যে ককেসিয়ান জাতি, ইহাতে সন্দেহ নাই। এশিয়ার মধ্যভাগে কোন সময়ে যে ককেসিয়ান জাতি বাস করিত, ইহার প্রমাণ নাই। উক্ত স্থানে মোগল জাতির আবাসভূমি। এক্ষণেও সেই জাতি তথায় বাস করিতেছে। য়ুরোপীয় রুসিয়ার দক্ষিণস্থ কৃষ্ণসাগরের সমীপে যে ককেসাস পর্ব্বত আছে, তাহারই সানুদেশে এই জাতির জন্মভূমি। এখনও তথায় ককেসাস জাতি বাস করিতেছে দেখা যায়। এইস্থান এক্ষণে জোরজিয়া বলিয়া অভিহিত। কোরজিয়ানেরা পৃথিবীমধ্যে সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের কামিনীরা ভূমণ্ডল মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। ইহারা ককেসিয়ান জাতির আদর্শ মানব ও মানবী। তাহা হইলে স্পষ্ট ভাবে প্রতীত হয় যে যে জাতি ভারতে শেষে আসে, সে জাতি কৃষ্ণ ও কাসপিয়ান সাগরের তট হইতে ভারতাভিমুখে আগমন করে। এবং তথায় বসবাস আরম্ভ করে।

ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে পাঞ্জাবে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আর এক জাতি পরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই জাতি আর্য্য-জাতি বলিয়া খ্যাত। এই জাতি অতিশয় সভ্য ছিলেন। পশু পালন ও কৃষিকার্য্য এই জাতির লোকদিগের কার্য্য ছিল। পাঞ্জাবে এই জাতি যে নিরাপদে বাস করিতে পারিয়াছিলেন বোধ হয় না। সময়ে সময়ে অনার্য্য জাতিরা তাহাদিগের উপর ঘোর অত্যাচার ও উৎপাত করিত। তবে আর্য্যজাতিদিগের যুদ্ধাস্ত্র উক্ত অসভ্য জাতিদিগের সমরাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। এবং এই জাতি অনার্য্য জাতিদিগের অপেক্ষা সমর-কুশল ছিলেন। তজ্জন্য অনার্য্য জাতিরা আর্য্যদিগের সমীপে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিত। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের পাঞ্জাব বাস নিরাপদ হইয়াছিল। অনার্য্যেরা তাহাদিগের যুদ্ধাস্ত্রের ভয়ে প্রায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিত না। বহুকাল

প্রাচুর্য্য সহকারে সুখে, স্বচ্ছন্দে ও সচ্ছলভাবে এবং নিরাপদে তাঁহারা তথায় বাস করিয়াছিলেন। এইস্থান পরে ব্রহ্মবর্ত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। এইস্থানে প্রথমে বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের ভাষা অতি উৎকৃষ্ট ছিল। এই ভাষা সংস্কৃত ভাষা বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাত। যদিও বৈদিক ভাষায় ও তৎপরবর্ত্তী ভাষায় অনেক বৈলক্ষণ্য ও তারতম্য দৃষ্টি গোচর হয়, তথাপি যে অধুনাতনী সংস্কৃত ভাষা বৈদিক-ভাষার সংস্কার, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ক্রমে তাহাদিগের সংখ্যা অধিক হইলে, পাঞ্জাবে উপরোক্ত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাহাদিগের বাসের সমাবেশ ও সুবিধা না হওয়ায় তাহাদিগের অন্য স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের আবশ্যকতা হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহাদিগের মধ্যে অনেক লোক পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া উহার পূর্ব্বদিকে আসিয়া বাস করে। কুরুক্ষেত্র পাঞ্জাব, শূরসেন, মৎস্য, কোশল, কাশী, বিদেহ, মগধ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে উপনিবেশ করিয়াছিল। পরে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্জাব ও শূরসেন দেশ ব্রহ্মর্ষি দেশ ও অন্যান্য দেশ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া কথিত হয়। যে ভূভাগের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে সাগর ও পশ্চিমে সমুদ্র পরে তাহা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া খ্যাত হয়। ক্রমে আর্য্যেরা দাক্ষিণার্ত্তে উপনিবেশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ বিশারদ বীরকুল অগ্রগণ্য পরশুরাম মালবর উপকূলে বাস করেন। এবং পরে অগস্ত্য মুনিও দক্ষিণাত্যে গিয়া বাস করেন। তিনি বিন্ধ্যাচল অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণাত্যে গমন করিয়া আর আর্য্যাবর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না। বোধ হয় কোন মাসের প্রথম দিনে তিনি দক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। এবং যাত্রা করিয়া আর দেশে প্রত্যাগমন করেন না বলিয়া মাসের প্রথম তারিখ অগস্ত্যযাত্রা বলিয়া কথিত হয়।

যাহা হউক এক্ষণে আমার বক্তব্য যাহা তাহা বলা যাউক। ভারতে বিবিধ জাতির বিষয় অদ্য আমার আলোচ্য বিষয়। এবং ইহা নানাবর্ণ ও নানাজাতির বাসভূমি হইয়া উন্নতির পথে গমন করিয়াছে না অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইলে ভারত কেন এইরূপ অধঃপতিত হইয়াছে, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবে।

আর্য্যেরা উপনিবেশ আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে অনার্য্য জাতিদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিরূপ বা কতবার যে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ঘোর সংগ্রামে বারম্বার পরাভূত ও পরাজিত হইয়া অনার্য্য-জাতিরা আর্য্যদিগের ভয়ে ভারতের সমতল ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গহনবন ও পর্ব্বত-আশ্রয় আশ্রয় করে। অধুনাতন সময়েও তাহারা সেইভাবে তথায় রহিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কতক জাতি আর্য্যদিগের বশতাপন্ন হয়। যে অনার্য্য-জাতিরা আর্য্যদিগের ভয়ে পর্ব্বত ও বন আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারা সুবিধা পাইলে আর্য্যপল্লী ও আর্য্য-তপোবনে উপস্থিত হইয়া লোকদিগের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত। আর্য্যেরা

একত্রে সমবেত হইয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিতেন। যে সময়ে অযোধ্যায় সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ প্রবল প্রতাপান্বিত ও পরাক্রান্ত ছিলেন, সেই সময় আর্য্যাবর্ত্ত তাহাদিগের একছত্র ছিল, এবং তাঁহাদিগেরই সুশাসনে ইহা সুশাসিত হইয়াছিল। তাহাদিগের পরাক্রমে বহিশত্রু ভারত আক্রমণে নিরস্ত ছিল। তখনও এই অনার্য্য-জাতিরা আর্য্য-পল্লীতে প্রবেশ করিয়া অধিবাসীদিগের উপর অত্যাচার ও তপোবনে প্রবেশ করিয়া ঋষিদিগের যাগ-যজ্ঞ ভঙ্গ করিত। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাড়কা নাম্নী রাক্ষসী ও তৎপুত্র মারিচ ও তাহাদিগের সহচরবৃন্দের দ্বারা ঘোর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া অযোধ্যার মহারাজা দশরথের সমীপে গমন করিয়া তাঁহার আত্মজ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে তন্নিবারণ জন্য তাঁহার তপোবনে প্রেরণ নিমিত্ত অনুরোধ পূর্ব্বক রাজ-সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া উপরোক্ত বীরদ্বয়কে তাঁহার তপোবনে আনয়ন পূর্ব্বক উক্ত রাক্ষসীর নিধন সাধন করিয়াছিলেন। এবং রাক্ষসীর পুত্র মারিচ ও তাহার সহচরেরা রামচন্দ্রের ধনুষ্টঙ্কারে ভীত হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুদূর লঙ্কায় পলায়ন করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে আর্য্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে গুণ কর্ম্মানুসারে তাহারা তিন জাতিতে বিভক্ত হয়। ধর্ম্মযাজনকারীরা ব্রাহ্মণ, রাজ্যরক্ষা ও শাসন যাহাদিগের কার্য্য হইল,তাহারা ক্ষত্রিয় ও বাণিজ্য এবং কৃষিকারীরা বৈশ্য বলিয়া অভিহিত হইল। যে সকল অনার্য্য জাতি তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিল,তাহারা শূদ্র নামে খ্যাত হইল। উপরোক্ত তিন জাতির সেবা শেষোক্ত জাতির কার্য্য ছিল। এই জাতি চতুষ্টয়ের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল ও তাহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিত। প্রতিলোম বিবাহের ফলে বিবিধ সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হয়। স্মৃতিতে এইরূপ বহু সঙ্করবর্ণের নাম দৃষ্ট হয়। মহাভারতেও সঙ্করবর্ণের এক বৃহৎ তালিকা আছে। এক্ষণে স্মৃতি ও মহাভারত উল্লেখিত অনেক সঙ্করবর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। আবার তৎস্থানে নূতন সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই সঙ্করবর্ণের উৎপত্তির পর হইতেই ভারতে অধুনাতন সময়ে যে ভাবে জাতি ভেদ আছে, সেই ভাবে জাতি ভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির গৃহে অন্ন গ্রহণ আর করিত না।

পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে অনার্য্য অধিবাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ও এক্ষণে দেখা গেল ভারতে আর্য্য সমাজও বিবিধ জাতির ও বর্ণের সমষ্টি। তাহা হইলে ভারত নানা জাতির ও নানা বর্ণের আবাসভূমি। তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

শেষে ভারত আর্য্যদিগের সম্পূর্ণভাবে অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাহারা ভারতকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা তাহাদিগেরই সম্পত্তি হইয়াছিল। আর্য্য সভ্যতায় ভারত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের উপর আর্য্যদিগের প্রভাব সর্ব্বতোভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভারত আর্য্যদিগের প্রভুত্বে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পূর্ণ ভাবে অবস্থান করিয়াছিল। ভারতে সম্পূর্ণভাবে আর্য্য রাজত্ব সংস্থাপিত হইয়া শাসনপ্রণালী দ্বারা

ইহাকে শাসিত করিয়াছিল। অনার্য্য জাতিরা তাহাদিগের সমীপে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চির-কাল জন্য ভারতের সমতল ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড় বনে ও দুর্গম পর্ব্বতে লুক্কায়িত ও গোপন ভাবে অবস্থান করিত। ভারতের উপর তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। কতকাল হইল অনার্য্য জাতিরা ভারতের সমতল ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বত ও বন আশ্রয় করে, এখনও তাহারা তথায় সেইভাবে বাস করিতেছে। তবে এক্ষণে ইংরাজদিগের শাসন প্রভাবে তাহাদিগের মন হইতে আর্য্য ত্রাস ও ভয় বিদুরিত হইয়াছে। তাহারা এক্ষণে নির্ভিক হৃদয়ে ভারতের বন পার্শ্বে সমতল ক্ষেত্রে চাষ আবাদ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছে।

যদিও ভারতে অনার্য্যজাতিদিগের অনেক জাতি বর্ত্তমান, তথাপি সেই জাতি ভেদের সহিত ভারতের উন্নতি ও অবনতির সম্পর্ক ছিল না। ভারত আর্য্যদিগের অধিকারভুক্ত, ভারতের উন্নতি ও অবনতি তাহাদিগের উপর নির্ভর ছিল।

ভারত বহুকাল আর্য্যদিগের শাসনাধীন থাকিয়া শেষে ভিন্ন ভিন্ন জাতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সপ্ত বা অষ্ট শতাব্দী হইল ভারতে আর্য্যদিগের প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছে। আর্য্যদিগের নিজস্ব ভারত এক্ষণে পরকরতলগত। কেন হইল, এই তথ্য অনুসন্ধান জন্য যত্ন ও প্রয়াস করা যাই-তেছে। একজন সত্যসন্ধ অনুসন্ধানকারীর চক্ষে ইহার মূল কারণ পতিত হইতে অধিক অনুসন্ধানের আবশ্যকতা হয় না। ইহার মূল কারণ জাতীয়হীনতা, দুর্ব্বলতা ও তথায় এক-তার অভাব।

কি নিমিত্ত ভারতে এইরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার কারণ নির্দ্দিষ্ট না হইলে ইহার উন্নতি-কল্পে কোন কথা বলা যায় না। এক্ষণে তদ্বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

(১) ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ। য়ুরোপীয় রুসিয়া পরিত্যাগ করিয়া যে ভূভাগ পরিদৃষ্ট হয়, ইহা তদপেক্ষা বৃহত্তর। য়ুরোপের এই ভূভাগে কত রাজ্য সংস্থাপিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতেও অনেক অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। এ সকল রাজ্যেরই অধিপতিগণ কখন একতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষযুক্ত ও পরস্পরের উন্নতি দেখিয়া কাতর হইত। কেহ কাহার প্রতি প্রীতি সম্পন্ন ছিলেন না। প্রায় পরস্পরে ঘোর বিবাদে নিরত থাকিতেন। একে অপরকে আপনার অধীনে আনয়ন জন্য চেষ্টা করিতেন। এরূপ স্থলে একতা স্বপ্নবৎ।

(২) ভারত বিবিধ জাতির ও বর্ণের আবাস-ভূমি। এক জাতি অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ করে না। এমন কি এক জাতি অন্য জাতির দান পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না। এক জাতি অন্য জাতির আসনে উপবিষ্ট হইতে ঘৃণাবোধ করে। যাহারা উচ্চ জাতি বলিয়া অভিমান করে, তাহারা যে জাতিকে নীচ ও অন্ত্যজ বলিয়া মনে করে, তাহাদিগের ছায়া স্পর্শ করিয়া স্নান করিয়া থাকে। আবার ভারতে বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অধিবাস। এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক অন্যধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অন্তরের সহিত চরমোৎকর্ষ হইয়া-

ঘৃণা করে। যে দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে এরূপ ঘৃণা, দ্বেষ ও অপ্রীতি বর্ত্তমান, তথায় কিরূপে তাহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে। তজ্জন্য ভারতে একতার গ্রন্থির শিথিল হইয়াছে।

অনার্য্যদিগের মধ্যে একতা না থাকার নিমিত্ত ভারতের কোন অপকারের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু আর্য্যদিগের মধ্যে একতাবিহীন হওয়ায় ভারতের বিশেষ অপকার হইয়াছে। এইজন্য ভারত পরহস্তগত এবং বিভিন্ন জাতির শাসনে শাসিত। ভারতের জাতিগত উন্নতি প্রায় লুপ্ত। এবং জাতীয়ভাবের অবনতির একশেষ হইয়াছে। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের আর শ্রীবৃদ্ধি নাই। প্রাচীন সময়ে ভারতের চিন্তাশীল মনীষীগণ সংহিতা লিখিয়া তথাকার মানব সমাজের যেরূপ বন্ধন করিয়া গিয়াছিলেন, বহুকাল সেই বন্ধনে তাহা আবদ্ধ থাকিয়া এক্ষণে ক্রমে ক্রমে শিথিলীকৃত হইতেছে। ভারতে আর সেইরূপ সমাজ-সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিল না। ভারতে বীজগণিত ত্রিকোণমিতির প্রথম প্রণীত, জ্যোতি বিদ্যা প্রথম উদ্ভাবিত ও দর্শনশাস্ত্র প্রথম প্রকটিত হয়। ভারতেই আধ্যাত্মিক চিন্তা চরমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতেই যোগশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, কেবল রচিত হয় নাই, তদনুসারে কার্য্য হইয়াছিল। ভারতের যোগীগণ যোগবলে অসাধ্য-সাধন করিতেন। অধুনা য়ুরোপে জড় বিজ্ঞানের দ্বারা যে সকল আশ্চর্য্যকর কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে. ভারতে যোগবলে তদপেক্ষা অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইত। ভারত পুণ্যক্ষেত্র। এই পুণ্যক্ষেত্রেই যোগের ছিল। যোগ কি প্রকার কার্য্য বোধ হয় ভারতবাসী ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা চিন্তা করিয়া তাহা সহসা বুঝিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে যে ভারতে একবারে জড় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয় নাই, বলা যায় না। ভারতাকাশে পুষ্পক রথ যেরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হইত, জড় বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াও য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহু চেষ্টায় ব্যোমপথে ব্যোমযান সমূহের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে এখন সেরূপ সমর্থ হইলেন না। ভারতে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের জটিল ও কুটিল প্রশ্ন সমূহ যে ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন পণ্ডিত তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। কিন্তু ভারত এক্ষণে হীন অবস্থাপন্ন হওয়ায়, ইহার সমীপে সকল প্রকার উন্নতির পথ নিরুদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে ভারতের অধঃপাত সম্পূর্ণভাবে হইয়াছে। ইহার এরূপ অধঃপাত কি জন্য হইল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টিকে জাতি বলা যায়। সমস্ত মানবের সমষ্টিকে মানব জাতি বলিয়া উল্লিখিত হয়। পৃথিবী মহা দেশে বিভক্ত। মহাদেশ আবার দেশে বিভক্ত। যে সকল লোক এক দেশে বাস করে ও যাহাদিগের ধর্ম্ম ও স্বার্থ এক, তাহাদিগকে এক জাতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। গোষ্ঠী, গোত্র, বংশ, কুল প্রভৃতি শব্দ জাতি শব্দের অন্তর্ভূত। এক এক দেশের অধিবাসীগণ আপনাদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত

যে একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহাকে জাতীয় একতা বলে। ভারতে নানা জাতির বাস। তন্মধ্যে আর্য্যজাতি প্রধান। আর্য্যজাতি আবার ভিন্ন গোষ্ঠী, গোত্র, বংশ ও কুলে এবং সঙ্কর বর্ণে বিভক্ত। আবার তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। তজ্জন্য তথায় জাতীয় একতাব অভাব হইয়াছে। সঙ্কর বর্ণ যে দেশের অমঙ্গল ও অকল্যাণকর তাহা গীতার নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

"উৎসীদেয়ুরিমে লোকান্ ন কুর্য্যাৎ কর্ম্মচেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজা ॥ ২৪

ভগবান বলিলেন—"আমি যদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করি, তবে এই সকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে। আমি তাহা হইলে বর্ণসঙ্করের কর্ত্তাও এই সকল প্রজাগণের মলিনতার কারণ হইব।

মানব-সমাজ মানবের সমষ্টি। এক সমাজের লোকেরা যদি পরস্পর দ্বেষপূর্ণ হয়, যদি পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে, এবং পরস্পরে সহানুভূতি শূন্য ও পরস্পরে প্রীতি হীন হয়, তাহা হইলে সে সমাজে একতা থাকিতে পারে না। আর্য্য-সমাজের যাহারা বিশুদ্ধ ও উন্নত জাতি, তাহারা সঙ্করবর্ণদিগের উৎপত্তির অবৈধতা হেতু তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের অন্ন গ্রহণ করেন না, তাহাদিগকে একাসনে উপবেশন করিতে দেন না, এমন কি তাহাদিগের ছায়াস্পর্শে ঘৃণা করেন। এরূপ অবস্থায় তাহারা পরস্পরে প্রীতি ও সহানুভূতি পূর্ণ হইতে পারে না। তজ্জন্য আর্য্য-সমাজ একতাবিহীন। ইহাই সমাজের মালিন্যের [illegible]

যে সমাজ একতাবিহীন, সে সমাজের লোকেরা মিলিতভাবে স্বদেশের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা জন্য অগ্রবর্ত্তী হয় না। সমাজে একতার অভাবে ভারতের অধঃপাত ও জাতীয় শক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে।

ভারত যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত, এরূপ আর পৃথিবীর কোন দেশে দেখা যায় না। এই সকল অধিপতিগণ স্ব স্ব প্রধান ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা ভয়ানকভাবে আধিপত্য করিত। সকল নৃপতিরই অভিমান ছিল যে তিনি অন্যান্য নরপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এবং এই জন্যই প্রায় পরস্পর যুদ্ধে নিরত থাকিতেন। একতা তাহাদিগের মধ্যে আদৌ বর্ত্তমান ছিল না। ভারত যে তাহাদিগের সাধারণ দেশ, ইহা তাহারা জানিতেন না। ভারতের উন্নতি-কল্লে তাহাদিগের কোন চেষ্টা ছিল না। ভারতের রাজাগণ একতাবিহীন ছিলেন বলিয়া বহিশক্র ভারত আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতে সমর্থ হইত। ভারত তন্নিমিত্ত বারম্বার-বহিশক্রর উপদ্রবে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত, তাহাদিগের ঘোর উৎপীড়নে উৎপীড়িত ও বিষম অত্যাচারে অত্যাচারিত এবং তাহার ধন বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। কতবার যে ভারত কত বহিশক্র দ্বারা আক্রান্ত ও তাহাদিগের পীড়নে পীড়িত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জাতীয় শক্তির অভাবে ভারত বহুবার এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল।

জাতিভেদ ভারতে একতা বিহীনতার দ্বিতীয় কারণ। জাতিভেদ জন্য উচ্চ জাতি

নিকৃষ্ট জাতির অন্নগ্রহণ, এমন কি নীচ জাতির গৃহে গমন করেন না। উচ্চ জাতি নীচ জাতিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, উহার প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকে। সামাজিক প্রথানুসারে উচ্চ জাতিকে কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে তৎপ্রতি যে সন্তুষ্ট হয় না, ইহাতে সন্দেহ নাই। মানুষ যত ছোট ও যত নীচ বলিয়া বিবেচিত হউক, কেহ অভিমান শূন্য নহে। কেহ কাহার দ্বারা ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত হইবে, আবার তাহার পদ লেহন করিবে, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। *

শ্রীকানাইলাল নাগ।

---

# অবসান।

## চতুর্থ অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—উপবন।

ঊর্ম্মিলা। (স্বগতঃ) আজ যেন পৃথিবীর মুখ কার যেন শোকের অঞ্চলে ঢাকা পড়েছে। সবাই যেন কাঁদছে, সবারই মুখ যেন মলিন হয়েছে। যারা আমার আনন্দের সাথী তারা আজ যেন বিষাদ সাগরে ভেসে যাচ্ছে। এই উপবন অন্য দিন যেন আলো হয়ে থাকে, আজ যেন নিদারুন শোকের ভারে বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। লতা গুলি যেন দুখের ভারে ঢলে পড়েছে, ফুল গুলির চোখ দিয়ে যেন জল ঝরছে। কুসুমে খচিত তরুগুলি স্পন্দন হীন হয়ে, যেন এক মহা ঝটিকার প্রতীক্ষা করছে। প্রতি দিন যে পাখী ডাকে আজও তো সেই পাখী ডাকছে; তারা সেই গানই গাচ্ছে; এই গানই তো অন্য দিন বেশ মিষ্ট লাগে, শুনিতে শুনিতে কত পুরাতন সুখের স্মৃতি জেগে উঠে। আজ যেন মনে হচ্ছে ওরা কার শোকের গান গাচ্ছে। গান তো নয়, যেন কাকে আজ জন্মের মত বিদায় দিয়ে তার শোকে সমস্বরে কাঁদচে। আর ঐ প্রভাত পবন প্রতি তরুতলে প্রতি লতা গৃহে প্রতি পুষ্পের কাণে কাণে কার যেন বিপদের কথা মৃদুস্বরে বলে বলে বেড়াচ্ছে। সবারই মুখ যেন বিষণ্ণ, যার মুখ পানে চাচ্ছি, সেই যেন অন্তরের রোদন অনেক কষ্টে গোপন করে' আমার সঙ্গে কথা কচ্ছে। তখন মাণ্ডবী দিদির সঙ্গে দেখা হ'ল, আমাকে সম্মুখে দেখেও তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন না। কি যেন বলতে গিয়ে অনেক কষ্টে কথাটা গোপন করে, অন্য ঘরে চলে গেলেন। পৌরজন সকলেই কি যেন একটা ভয়ানক কথার কাণা ঘুসা করচ্ছে। আচ্ছা, আমাকে তা বলছেন না কেন? আমি তাদের কাছে কি অপরাধ করেছি? নিশ্চয়ই অভাগীর কপালে কোন একটা বিপদ ঘটেছে। তিনিও ত কৈ এলেন না। সেই যে কাল আমায় আসি বলে চলে গেলেন, আর এলেন না কেন?

শ্রুতকিত্তীর প্রবেশ।

শ্রুত। দিদি! এর মধ্যে আবার এখানে এসেছ? আমি তোমাকে কত খুজলাম!

ঊর্ম্মিলা। হ্যাঁ, এইখানেই এলাম, কাল [illegible]

---

* লেখক, ভারতে নানা জাতির বসবাস এবং তাহাদের মধ্যে অনৈক্যতাই অধঃপতনের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মতে জাতীয় উচ্চ নীচতাই মূল কারণ নহে, উচ্চ নীচতা না থাকিলে জাতীয় উন্নতি হয় না,—ধর্ম্মহীনতাই এ অধঃপতনের মূল কারণ। সম্পাদক।

লোকের গোলমাল যেন ভাল লাগছেনা শ্রুত। সত্যি। দিদি! কি যেন হয়েছে! কিছুই ভাল লাগছে না কেন বল দেখি? শুনলাম কাল থেকে রাজ সভায় কি একটা কথা নিয়ে ভারী গোলমাল হচ্ছে, কত সব মুনি ঋষি এসেছে; জান কি কিসের এত গোলমাল?

উর্ম্মিলা। কেমন করে তা জানবো? কাল হ'তে আরতো তাঁর দেখা পাই নাই; সন্দেহে আমার প্রাণ আকুল হযে উঠছে।

শ্রুত। ওকি দিদি আজ সিঁথের সিন্দুর দাও নাই কেন? শুধু সিথেয় কি থাকৃতে আছে?

উর্ম্মিলা। সত্যি নাকি, দিই নাই? দেথছ এ নি অন্যমনস্ক হয়েছি, সিন্দুরের কৌটাটি খুলে সিঁন্দুর দিতে ভুলে এসেছি।

শ্রুত। দিদি এত অন্যমনস্ক হলে কেন? শুধু আজ বলে নয়, আজ কয়দিন হতে তোমাকে এমনি দেখছি। এখনও কি স্বপনের কথা ভুল্‌তে পার নাই।

উর্ম্মিলা। শুধু স্বপ্ন নয় ভগিনী, আমার কপালে বুঝি আর সুখ নাই। কাল সেই তোমরা চলে গেলে, তিনি উপবনে এলে তাঁর যে ভাব দেখলাম, সেই ভাব দেখেই আমার বুক ভেঙে গিয়াছে। সে তো সহজ অবস্থা নয়, কথার স্থির নাই, মুখে আনন্দের চিহ্ন নাই, আমি সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকে যেন দেখতে পেলেন না। কেন তাঁর এ অবস্থা দেখলাম?

শ্রুত। কি জানি দিদি! কেবল পদে পদে বিপদেরই আশঙ্কা হয়, তোমাকে কি বল্লেন।

উর্ম্মিলা। আমাকে কত্থন পরিহাস করছি, কিন্তু তা তো আমার বিশ্বাস হলো না।

শ্রুত। ঐ দেখ দিদি! তোমার হরিণ শিশুটা আজ আবার পালিয়ে এসেছে, ঐ দেখ ছুটে পালাচ্ছে, এই খানে থাক আমি ওকে ধরে নিয়ে আসি। প্রস্থান।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) আহা!

প্রিয়া মোর আনন্দরূপিনী
সদানন্দে ভ্রমিছে প্রমোদ বনে।
কেমনে জানিবে বল কুসুমহাসিনী
কি ভীষণ সর্ব্বনাশ আসিছে সম্মুখে?
আহা! ঐ কুসুম কোমলা!
সুখ-স্বপ্ন-মুগ্ধ হৃদয়েতে
উঠে কত সুখের হিল্লোল অবিরাম।
অভাগিনী শুনিবে যখন
"কাল তুমি হবে অনাথিনী"
কি ভীষণ অশনি সম্পাতে
ভেঙে যাবে কোমল হৃদয়,
আহা, স্মরণে শিহরে প্রাণ
পাষাণ সমান,
মম এ সুদৃঢ় হৃদয়ে
সহিবারে পারি শত ব্যথা,
সহে প্রাণে সহস্র যাতনা।
কিন্তু ঐ কোমল-হৃদয়ে,
কেমনে সহিবে এত যাতনার ছায়া,
তবে যাই বিলম্বে বাড়িবে স্নেহ;
কিন্তু হায়! যাব জনমের মত,
আশা মিটাইয়া দেখিব না একবার;
একবার প্রেম পুলকিত
সরোজ আননখানি;
করিব না শেষের চুম্বন?

তিল আধ না হেরিলে মোরে,
অন্ধকার হেরে যে সংসার,
হায় ! চির বিদায়ের কালে
না ব'লে যাইব তারে ?
হ'ক হৃদি যতই পাষাণ
পারিব না, না বলে যাইতে,
যাই—বলে যাই
নিয়ে যাই শেষের বিদায়।

( ঊর্ম্মিলার প্রতি )

প্রিয়ে ! আসিয়াছি পুনর্ব্বার ;
কাননের ফুলরাশি তুমি
এসেছি দলিতে সেই ফুল।

ঊর্ম্মিলা। এস নাথ ! এস প্রাণেশ্বর !
পিপাসিতা চাতকিনী আমি
আশাপথ রয়েছি চাহিয়ে,
যতক্ষণ নাহি দেখি সম্মুখে তোমায়
দণ্ডে যুগ মনে যেন হয়,
সেই আসি বলে, গেলে চলে প্রাণনাথ
কৈ পুনঃ এলে না তো ফিরে ?
দাসী দোষী ! বল কিবা অপরাধ ?

লক্ষ্মণ। নাহি দোষ, নাহি রোষ
নাহি অতি মান
নাহি স্থান এ হৃদয় মাঝে
প্রেমের সে সুখ স্বপনের ?
দেখা বুঝি হবে না কো আর।
এই বুঝি জন্মশোধ দেখা,
তাই শেষ দিনে শেষ সম্ভাষণে
এসেছি লইতে প্রিয়ে শেষের বিদায় !

ঊর্ম্মিলা। প্রাণেশ্বর কেন হেন কুবচন মুখে,
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ মোর,
যাবে কোথা কারে, কিসের বিদায়
লইতে এসেছ নাথ ?

লক্ষ্মণ। প্রিয়তমে ! যাব যে দেশের মাঝে
নাহি তথা আলোক আঁধার
নাহি তথা শত্রু-মিত্র ভেদ,
নাহি যাতনার লেশ, শান্তি-নিকেতন,
নাহি শোক, নাহি তাপ, নাহিক মরণ,
নাই প্রিয়ে বিরহ-বেদন !
অবিচ্ছেদ মিলন সম্ভোগ,
ভুঞ্জে জীবে আনন্দ অপার,
দুঃখের মন্দির এই ধরণীর সনে,
নাহি প্রিয়ে সম্বন্ধ তাহার,
যাব প্রিয়ে সেই দেশে আমি।
হেরি তব অপাঙ্গ লহরী
বদনের বিমল মাধুরী
সরমে জড়িত মৃদু মরমের হাঁসিটুকু
অধরে যা পড়িত ঝরিয়ে
প্রাণের উৎসাহ বলে হরে
লয়ে সে সকল,
বিনিময়ে অশ্রুবিন্দু দিয়ে,
যাব সেই শান্তির নিলয়ে,
ছিল যে হৃদয়খানি, অমরার উপবন,
সদা প্রফুল্লিত—
ভেঙ্গে দিয়ে সে কোমল হৃদি,
শুষ্ক করি সোহাগের নদী
প্রেমের প্রতিমাখানি,
নয়ন অন্তরে রাখি,
স্বপ্নময়ী স্মৃতিটুকু লয়ে,
যাব সেই সুখের আলয়ে।
পিপাসিত চাতকের মত,
আশা কত রয়েছে জাগিয়া
অবিতৃপ্ত মিলনের তৃষা
রহিয়াছে জীবন ব্যাপিয়া
স্বপনের ছায়া মত,
কত যে প্রেমের কথা,
জাগিছে অন্তরে
ভাষা যে শবদ হীন,
পাই নাই প্রাণাধিকে বলিবারে তোরে।
রুদ্ধ আছে অন্তরের ভাষা
তৃপ্ত নহে আশার সে আশা
বুকের মাঝারে ধরি,
অবিতৃপ্ত আশা সিন্ধু,
ভগ্নপ্রাণে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
যাব সেই শান্তিপূর্ণ সুখের আলয়ে।

ক্রমশঃ—

শ্রীযতেন্দ্রমোহন [illegible]।

# অন্ধের যষ্টি।

চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধের প্রভেদ এ জগতে চিরদিনই আছে। চক্ষুষ্মানের কাছে অন্ধ চিরদিনই পদানত। চক্ষুষ্মান্ স্বয়ং চক্ষে দেখিয়া বস্তু বিচার করেন, অন্ধ কেবল শোনা কথায় ভরসা রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সুতরাং প্রভেদ বিস্তর। চক্ষুষ্মানের কথা অদ্য আমরা বলিব না। আমরা নিজে অন্ধ, তাই আমাদের নিজের শ্রেণীর কথাই বলিব। কত কাল ধরিয়া, কত দিন ধরিয়া, কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া এ জগতে অন্ধ হইয়া আমরা ঘুরিতেছি, তাহা জানি না। কেহ কেহ বলেন—মাতৃগর্ভেই আমরা অন্ধ ছিলাম, এখন চক্ষুষ্মান্ হইয়াছি, আমি তাহার বিপরীত বুঝি। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন—মাতৃগর্ভে শায়িত হইয়া শিশু অন্তশ্চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া পরম দেবতার দিকে তাকাইয়া থাকে। তবে তখন শিশু অন্ধ কেমন করিয়া? যে দিন হইতে মাতৃগর্ভ-স্খলিত হইয়াছি, আমরা সেইদিন হইতেই অন্ধ, ইহাই ঠিক কথা। আমার গুরুদেব বলিয়াছেন, যদি দেখিতে চাও, ত চক্ষু মুদিত কর, আর যদি অন্ধ হইতে সাধ যায়, তাহা হইলে চক্ষুরুন্মিলন কর। ইহাই চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধের লক্ষণ। দেখিবার বস্তু চক্ষু খুলিলে দেখা যায় না, কিন্তু মুদিলে দেখা যায়, এ বড় বিষম প্রহেলিকা। কথাটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। [illegible]. চক্ষুর সম্মুখে যাহা পড়িতেছে, তাহা মুহুর্মুহুঃ *পরিণামী, মুহুর্মুহুঃ বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে,* ইহা দার্শনিক সত্য। প্রাকৃতিক জগৎ কখনই এক অবস্থায় স্থির থাকিয়া দাঁড়াইতে পারেনা, পলে পলে পরিণামের ঘর্ঘরচক্রে কেবলই বিভিন্ন অবস্থায় ঘুরিতেছে। এই যাহা ছিল, পর ক্ষণে তাহা নাই, কল্য যাহা ছিল, তাহা অদ্য নাই। অতীতে যাহা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে নাই, বর্ত্তমানে যাহা রহিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে থাকিবে না। এই ছিল এই নাই। এই দেখিতে দেখিতে এই অন্যরূপ হইয়া গেল! কেবলই নূতন, কেবলই নূতন, কেবলই চঞ্চল, কেবলই চঞ্চল। এখন দেখুন, বিস্ফারিত চক্ষু যে বাহ্য জগতকে দেখিবে, তাহার অবিরল পরিবর্ত্তনে তাহাকে স্থির ভাবে দেখিতে পারে কৈ? ঐই যাহাকে দেখিলে, পরক্ষণে আর তাহা নাই। এই দেখিতে দেখিতে বিদ্যুতের ন্যায় তাহা অদৃশ্য হইল, বিভিন্ন বস্তু আসিল, আবার তাহাও অদৃশ্য হইল। আবার আসিল, আবার অদৃশ্য। ইহার নাম কি দেখা? বাজিকরের অঙ্গুলির উপর কোন গোলাকার পদার্থ তীব্র-তেজে ঘুরিলে দৃষ্টি যেমন তাহাকে স্পষ্ট রূপে ধরিতে পারে না, কেবল একটা রেখার মত তাহাকে

অস্পষ্ট ভাবে দেখে, সেই রূপ কুহকী বিরাট ঐন্দ্রজালিকের নখাগ্রে পরিণাম-চক্রে বিঘূর্ণিত এ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর যথার্থ স্বরূপ স্পষ্ট-রূপে আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত হইতেই পারে না। ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক বিকাশ দর্শনে যেমন তৃপ্তি লাভ হয় না, সেইরূপ অবিরত পরিবর্ত্তন-শীল পদার্থ দর্শনে নেত্রের তৃপ্তি হইতে পারে কৈ? চক্ষু যাহাকে সুন্দর দেখিয়া আবার দেখিতে গেল, অমনি তাহা পরিণতির নিয়ম-কৌশলে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। চক্ষু যাহা ভাল বলিয়া দেখিয়াছিল, তাহা আর সেরূপ রহিল না; চক্ষুর সাধ মিটিল না। একটা গল্প মনে হইতেছে—কোন একটি নবাবের বাড়িতে একটি ফকির উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবাব বিশেষ সৎকার পূর্ব্বক তাঁহার আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ভোজনের সময় নবাব তাঁহার সহিত এক সঙ্গে বসিলেন। নবাবী চাল এক অদ্ভুত ব্যাপার। ফকিরকে খাওয়াইবার জন্য অতি উপাদেয় তিন শত রকমের ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাবুর্চ্চি এক একটি ব্যঞ্জনের পাত্র ফকিরের থালের কাছে দেয়, যাই ফকির তাহা একবার খান, আর অমনি তাহা নবাবী রীতি অনুসারে উঠাইয়া নূতন ব্যঞ্জন-পাত্র রাখিয়া দেয়। এইরূপ তিনশত রকমের ব্যঞ্জন এক একবার চাকিতে চাকিতেই ফকিরের উদর পুরিয়া গেল। ফকির ভোজন সমাপ্ত করিয়া আচমন করিলেন। আচমনান্তে নবাব ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইল ত? ফকির উত্তর করিলেন, এমন দুঃখের ভোজন আর আমি কখন করি নাই। যে ব্যঞ্জনটিই খাই, তাহাই উপাদেয়, যাই তাহা পুনরায় খাইতে ইচ্ছা হয়, আর অমনি তাহা উঠাইয়া নূতন ব্যঞ্জন দেওয়া হয়। আশা মিটাইয়া কোনটিই খাইতে পাইলাম না। সুতরাং ভোজনে তৃপ্তি হইল না। ফকিরের এ কষ্টময় ভোজনে, এ অবিরত ব্যঞ্জন পরিবর্ত্তনে যেমন কিছু মাত্র তৃপ্তি হয় নাই, সেইরূপ জগতের পদার্থপুঞ্জের অবিরত পরিবর্ত্তনে, একটার পরক্ষণেই আর একটার দর্শনে নেত্রের কিছু মাত্র তৃপ্তি নাই। যাহাতে স্থৈর্য্য নাই, অস্পষ্ট ভাবের কুয়াসা যাহাকে ঘিরিয়া আছে, তৃপ্তির পরিবর্ত্তে যাহা অতৃপ্তির ফোয়ারা খুলিয়া দেয়, সে দেখা দেখাই নয়। যে দেখা দেখিলে আর দেখিবার সাধ থাকে না, তাহাই প্রকৃত দেখা। যেখানে পরিণামের কণিকা নাই, চাঞ্চল্যের ছায়া নাই, প্রাণ ভরিয়া —বুক পুরিয়া স্থিরভাবে চিরদিন যাঁহার দর্শনের বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই, অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় যে সুধাধারা হৃদয় মন্দিরে প্রবাহিত হইতেছে, সেই নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় নিথর নিস্তরঙ্গ দিব্যপুরুষের দুর্ল্লভ দর্শনই প্রকৃত দেখা। তাই যোগী বলিয়াছেন, যদি দেখিতে হয়, ত চক্ষু যুগল মুদিত কর। আমাদের চক্ষু চিরদিনই বিস্ফারিত, মুদিত করিয়া কি দেখিতে হয়, তাহা জানিনা। সুতরাং যাহা দেখিবার, তাহা ত দেখা হয় না। আর যাহা (বাহ্যজগৎ) দেখিতেছি, তাহা ত প্রাণ ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া, স্থির ভাবে দেখিবার যো নাই। অতএব আমরা অন্ধ। চক্ষু থাকিতে অন্ধ। জগতের চারিদিকে মনোমোহন পদার্থের ডালি সাজান আছে,

ইহার মধ্যে যাহা দেখিলে আর দেখিতে হইবে না, দেখিবার সাধ মিটিয়া যাইবে, পিপাসা ছুটিয়া যাইবে, কামনা পুরিয়া যাইবে, হায়! তাহা না দেখিয়া অন্য সামগ্রী দেখিয়াই সময় কাটাইলাম, বড় দুঃখ, বড় পরিতাপ! যাত্রা শুনিতে আসিয়া যদি গল্প করিয়াই সময় কাটাই, তাহা হইলে যাত্রা শুনা হয় কৈ? সময় বৃথা যায়, সেইরূপ আমাদের চক্ষু দুইটি বৃথা। সুতরাং আমরা অন্ধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা নিজে অন্ধ। সুতরাং অন্ধের কথাই বলিব। চক্ষুষ্মান্‌দিগকে এ মণ্ডলীতে টানিয়া আনিব না। সৎসঙ্গ ও বিবেক-রূপ দুইটি অনন্ত চক্ষু দিয়া যাঁহারা দেখেন তাঁহারা মহাত্মা—মহাপুরুষ।

সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ং।
যস্য নাস্তি নরঃ সোহন্ধঃ কথং নাপৃতমার্গগঃ।

সে সমস্ত ঋষিদের যাহা আশ্রয়, যাহা করণীয়-কার্য্য, অন্ধ সে দিকে যাইতে পারে না। এ ঘোর কলিযুগে সৎসঙ্গ ও বিবেক উভয়ই আমাদের দুর্লভ। সৎসঙ্গের কথা মুখে বলি বটে, কিন্তু কাযে হওয়া বড় কঠিন। কথাটা কাটিয়া কুটিয়া দেখা যাক্। প্রকৃত সাধুকে, চেনা বড় সহজ নয়। আমি লেখা পড়া শিখিয়াছি, তর্কাভিমান আমার বিলক্ষণ আছে। সাধুকে চিনিতে তর্কই আমার প্রধান অবলম্বন। তর্কের দ্বার দিয়াই আমি তাঁহাকে বুঝিতে চাই, কিন্তু সাধু তর্ক করিতে নারাজ, তাঁহার কি দায় পড়িয়াছে, তিনি আমার সহিত বৃথা বকিয়া মরিবেন। খানিকক্ষণ বকিয়া তিনি নীরব হইলেন। আমি বুঝিলাম—তিনি আমার কাছে পরাস্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি আমা হইতে অসাধু। এই রূপে হয়ত কত পরম সাধুকে অসাধু বোধে ছাড়িয়া শেষে এক পরম ভণ্ডকে সাধু বলিয়া ধরিয়া বসি। পুষ্করিণীতে কাঁকড়া ধরিতে হয়ত সাপের গর্ত্তে হাত দিয়া ফেলি। সুতরাং সাধু চেনা বড় দায়। সাধুর কাছে হয়ত গেলাম, কিন্তু তাঁহার কোন্ টুকু সৎ, তাহা বুঝা বড় শক্ত কথা। সাধুর রক্তমাংসময় শরীর, বুদ্ধি, জ্ঞানোপদেশ, সাধনা, শাস্ত্র কথা, এ সমস্তের মধ্যে কোন্ টুকু সৎ, তাহা বাছিয়া লওয়া আমাদের মত অন্ধের সামর্থ্য বহির্ভূত। হয়ত গোটা কতক শুষ্ক জ্ঞানোপদেশ লইয়াই সাধুর কাছ হইতে ঘরে ফিরিলাম। ভাবিলাম ইহারই নাম সাধুসঙ্গ। তাহা ভুল। গোটাকতক জ্ঞানোপদেশই যদি তাহার ফল হয়, তাহা ত পুস্তকেও আছে। সুতরাং সাধুসঙ্গ বিভিন্ন বস্তু। শাস্ত্র—মহিষের দৃষ্টান্তে প্রকৃত সাধুসঙ্গ বুঝাইয়াছেন। কতক-গুলা মহিষ মশকের দংশনে অস্থির হইয়া জলে গিয়া পড়ে। জলে গা ডুবাইয়া পুনরায় মাটিতে উঠে। ভাবে, মশক-দংশন হইতে বুঝি পরিত্রাণ পাইলাম। কিন্তু যাই গায়ের জল শুকাইয়া যায়, আর পুনরায় মশকে ছাঁকিয়া ধরে। যে জ্বালায় পূর্ব্বে জ্বলিতেছিল, সেই জ্বালাতেই জ্বলিতে থাকে। কিন্তু যে সমস্ত মহিষ চতুর, তাহারা পুষ্করিণীর কর্দ্দমে লুটোপুটি খাইয়া নিজ অঙ্গে কর্দ্দম লিপ্ত করে। মশক সে পঙ্কলিপ্ত অঙ্গে দৃঢ়রূপে হুল ফুটাইয়াও তাহার কিছু করিতে পারে না। এইরূপ চতুর মহিষেরই জ্বালা মিটে, যন্ত্রণা ছুটে। এইজন্য বলিতে হয়—সংসারের জ্বালামালায় পরিতপ্ত হইয়া, যে ব্যক্তি

শীতল সাধুসঙ্গ-সরোবরে অবগাহন করিয়া সাধুর ভাব-কর্দ্দমে আপ্লুত হইতে পারেন, তাঁহারই প্রাণের জ্বালা মিটে, তিনিই প্রকৃত সাধুসঙ্গী। অচতুর মহিষের মত যিনি সাধুর পবিত্র শক্তিতে মাখাচোকা না হইতে পারেন, দিব্য তেজে অনুপ্রাণিত না হইতে পারেন, তাঁহার সাধু-সঙ্গ ব্যর্থ। তাঁহার জ্বালা চিরদিনই সমান, ত্রিতাপের অগ্নিশিক্ষা চিরদিনই তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে। সাধু যেখানে বাস করেন, সেখানকার স্থানীয় প্রকৃতি পবিত্র, সেখানকার যে আকাশ মণ্ডল, তাহা দিব্যতেজে পরিপূর্ণ। সেখানে যে বাতাস বয়, তাহাতে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, শরীর জুড়াইয়া যায়। গৌরাঙ্গদেব তাই বলিয়াছিলেন, "আয় রে মাধাই কাছে আয়, হরিনামের বাতাস লাগুক গায়"। সেই রূপ সাধুর গায়ের বাতাস লাগিলে জীবন ধন্য হয়। নিদাঘের নিদারুণ রৌদ্রে বিশুষ্ক হইয়া বৃক্ষ যখন জিয়ন্তে মরার মত দাঁড়াইয়া থাকে, এমন সময়ে বসন্তের প্রাণ মনোমোহন মলয় মারুত বহিয়ে বৃক্ষের চারিদিকে পুট পুট করিয়া ফল ফুল পল্লব যেমন গজাইয়া উঠে, সেইরূপ সাধুর পবিত্র সমীরণ লাগিয়া জীবের বিশুষ্ক হৃদয়-তরুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সন্ধিতে সন্ধিতে যদি নব-নধর-ফুলরাজি ফুটিয়া উঠে, তবেই তাহার নাম প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সাধুর যে উপদেশ পাইলে আর উপদেশ দিতে ইচ্ছা হয় না, তর্ক প্রবৃত্তি, জিগীষা, অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, বিরলে বসিয়া নীরবে প্রকৃত কার্য্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে, তাহাই প্রকৃত সাধুর উপদেশ। একটা গল্প বলিতেছি। রেওয়া রাজ্যের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। সেই রাজ্যের অধিপতির একজন কুলগুরু ছিলেন; তিনি মহা পণ্ডিত। তাঁহার পুত্রও কাশী হইতে গীতাদি শাস্ত্র পড়িয়া দেশে আসিলেন। রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি গীতাদি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের সহিত বিচার করিতে চাই। যদি কেহ এ বিষয়ে ইচ্ছুক থাকেন—তিনি আসুন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাশীতে কাহার কাছে গীতা পড়িয়াছেন, উত্তর হইল, কোন দার্শনিক পণ্ডিতের কাছে। রাজা বলিলেন আপনি প্রথমে কোন ভাল সাধুর কাছ হইতে গীতা পড়িয়া আসুন, তবে আপনার গীতাপাঠ শুনিব। ব্রাহ্মণ যুবক মনে মনে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কি করেন—রাজ-আজ্ঞা বলিয়া পুনরায় কাশীতে পড়িতে চলিলেন। পড়িয়া শুনিয়া দেশে আসিয়া পুনরায় রাজ সভায় বিচারের জন্য গেলেন। রাজা তখনও বলিলেন, আপনি পুনর্ব্বার পাঠার্থ গমন করুন। কোন প্রকৃত সাধুর কাছ হইতে আরও একটু ভাল করিয়া পড়িয়া আসুন। ব্রাহ্মণ যুবক আবার পড়িতে চলিলেন, এবার পড়িয়া যখন দেশে ফিরিলেন, তখন আর রাজ-সভায় গেলেন না। বাড়ীতে বসিয়া আপনারই মনে, আপনারই তানে তিনি গীতা অধ্যয়নে মগ্ন রহিলেন। বহুদিনান্তে রাজা সেই ব্রাহ্মণ যুবকের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পুত্র কি এখনও পড়া সাঙ্গ করিয়া বাড়ি আসেন নাই? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হাঁ মহারাজ, বাড়ী আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে রাজসভায় আর আসিতে চাহে না। ঘরে বসিয়া সে কেবল গীতা-পাঠই করে। এইবার রাজা মনে মনে বুঝিয়া বলিলেন, আচ্ছা তিনি না আসুন, আমিই তাঁহার

সহিত অদ্য দেখা করিতে যাইব। রাজা গুরু-গৃহে উপস্থিত হইলেন, গুরু-পুত্র তদ্‌গত-চিত্তে গীতাপাঠে নিমগ্ন। রাজার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি যে সাগরে ডুবিয়াছেন, যে রসে মজিয়াছেন, যে অমৃতধারা পান করিতেছেন, তাহা ছাড়িয়া বাহিরের দিকে তাঁহার চিত্ত যাইবে কেন? রাজা অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার আপনি রাজ সভায় বিচারের জন্য যান নাই কেন? উত্তর হইল, আমি যে এবার সাধুর নিকট হইতে ভাল করিয়া গীতা পড়িয়া আসিয়াছি। রাজা পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, এতদিনে আপনার ঠিক গীতা পড়া হইয়াছে। রাজা সন্তুষ্টচিত্তে এক খানি জায়গীর তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ যুবক যে সাধুসঙ্গ করিয়াছিলেন, সাধুর কাছ হইতে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, সাধুর নিকটে থাকিয়া পড়িবার সময় সাধুর যে পবিত্র শক্তির সঞ্চার তাঁহাতে হইযাছিল, তাহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ, প্রকৃত সাধুর উপদেশ। সাধুর কাছ হইতে গোটাকতক জ্ঞানের ভুয়া উপদেশ শুনিলেই আর সাধুসঙ্গ হয় না। যে সাধুসঙ্গে আপদ খণ্ডন হয়, বন্ধন মোচন হয়, সে সাধুসঙ্গ বড় কঠিন। আর প্রকৃত-বিবেক জ্ঞানও এ কলিযুগে দুর্লভ ব্যাপার। আমরা সৎসঙ্গ ও বিবেক-জ্ঞান, এই দুইটি চক্ষু হইতেই বঞ্চিত। সুতরাং আমরা অন্ধ। আমরা সাধ করিয়াই অন্ধ হইয়াছি—সাধ করিয়াই দুটি চক্ষুর মাথা খাইয়াছি। একটা মাতালের গল্প মনে হইতেছে। ইংলণ্ডের কোন একজন মাতালের অতিরিক্ত মদ্যপান জন্য চক্ষের পীড়া হয়। মাতাল ডাক্তারের কাছে ঔষধের ব্যবস্থা চায়। ডাক্তার বলিলেন—তোমাকে নূতন কিছু ঔষধ সেবন করিতে হইবে না। তোমার নিজ হইতে কিছু ছাড়িলেই হইবে। তোমাকে মদ্য-পান ত্যাগ করিতে হইবে। মাতাল বলিল, মদ্যপান না ছাড়িলে ঔষধ সেবনে চক্ষুর পীড়া আরাম হইবে না? উত্তর হইল—কিছুতেই না। মাতাল বলিল, then Good bye to my eyes. চোখ যায় যাক, মদ ছাড়া এ হাঁড়ে হইবে না। মাতাল অতিরিক্ত মদ্যপানে চক্ষু দুটি হারাইল। আমরাও সেইরূপ মোহ মদিরায় উন্মত্ত হইয়া চক্ষু দুইটি (সৎসঙ্গ ও বিবেক) হারাইয়াছি। "পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদ মদিরা-মুন্মত্ত ভূতং জগৎ" সাধারণ মাতালের মধ্যে কেহ বা দুই বৎসর, কেহ বা দশ বৎসর, কেহ বা চির জীবন মদ খায়, ইহার বেশী নহে। কিন্তু আমরা তাহা অপেক্ষাও ঘোর মাতাল। আমরা জন্ম জন্মান্তর হইতে মদ খাইতেছি। চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আমরা মোহ-মদিরায় হাবুডুবু খাইতেছি। এই অতিরিক্ত মত্ততার জন্য আমাদের চক্ষু দুইটি গিয়াছে। আমরা জন্মান্ধ। এ জন্মান্ধের উপায় কি? আশা ভরসার স্থল কি? অবলম্বন কি? অন্ধ কাহারও উপদেশ চাহে না। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্ তাঁহারা কোন কথা বুঝিয়া-সুঝিয়া, দেখিয়া-শুনিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু অন্ধের সে সামর্থ্য নাই। যদি কেহ কোন জিনিষ প্রস্তুত করিয়া অন্ধকে দেয়, অন্ধ তাহার জন্য হাত পাতিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু কোন জিনিষ করিয়া কর্ম্মিয়া লইবার ক্ষমতা অন্ধের

নাই! ভাত রাঁধিতে হইলে আগুন, কাঠ, উনুন, জল, তণ্ডুল এ সমস্ত চাই। এ সমস্ত যোগাড় করিয়া ভাত রাঁধিয়া খাইতে অন্ধ পারিবে না। কিন্তু যদি কেহ দয়া করিয়া প্রস্তুত অন্ন অন্ধের হাতে তুলিয়া দেন, অন্ধ তাহা তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিবে। জ্ঞানীর কাছে,যোগীর কাছে অন্ধের আশা নাই। তাঁহারা করিয়া কর্ম্মিয়া লইতে বলেন, অধিকারী হইতে বলেন। অন্ধ তাহা পারিবে না। অন্ধ বড় গরীব,পথের ভিখারী। যদি কোন মহাত্মা দয়া করিয়া অন্ধ-শালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, ভিখারীর জন্য সদা-ব্রতের দ্বার খুলিয়া দেন, তবে অন্ধের আশা মিটিতে পারে, কামনা পুরিতে পারে।

আমরা যখন বাহিরের অন্ধের দিকে তাকাই তখন দেখি, তাহার আশ্রয় যষ্টি। খাইতে শুইতে বসিতে অন্ধের তাহা পরমোপ-কারী বন্ধু। জগতে তাহার মত সম্বল অন্ধের আর কিছুই নাই। আজ পিতা মাতা আদি তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকিলেও যষ্টির আশ্রয়ে অন্ধ জীবনধারণ করিতে পারে। কিন্তু যষ্টির অভাবে সে এক পাও চলিতে পারে না। সুতরাং জগতে অন্ধের যষ্টির ন্যায় পরম আত্মীয় আর কেহ নাই। তাহার যষ্টি হয়ত হাঁতির দাঁতের দ্বারা নির্ম্মিত হইতে না পারে, কিন্তু তাহা অমূল্য। সেই সামান্য বংশ-খণ্ড অল্পমূল্যের হইলেও অন্ধের পক্ষে আঁধারের মাণিক। আমরা অন্ধ। আমাদেরও অন্ধের মত এইরূপ একটা যষ্টি চাই। যে যষ্টি জীবন্ত প্রাণীর মত আপনা আপনি রাস্তা বাঁকিয়া, আপনা আপনি মোড় ফিরিয়া এ অন্ধকে পরি-চালিত করিতে পারিবে, সেইরূপ যষ্টি চাই। অন্ধ কোন্ দিকে যাইতে হয়, তাহা জানে না, শুনে না বুঝে না. এ পথহারা পথিককে সুপথে আপনা আপনি লইয়া যাইতে পারে—এইরূপ একটা অবলম্বন চাই। বাহিরের অন্ধ যষ্টি ধরিয়া আপনার মতে, আপনার পথে আপনি চলে; কিন্তু আমার মত অন্ধের সেরূপ হইলে চলিবে কেন। আমার এমন কলের যষ্টি চাই. যে যষ্টি নিজ গুণে আমাকে চালাইবে। অপথ কুপথ আমি দেখিতে পাই না, কলের যষ্টি আপ-নিই আমাকে সেদিক হইতে ঘুরাইয়া দিবে, যেদিকে গর্ত্ত (নরক), সেদিকে যাইতে বাধা দিবে, যষ্টি আমাকে আমায় চিরবিশ্রাম ভবনের দিকে অর্থাৎ যে ধামে গমন করিলে আর আমাকে পথে পথে ঘুরিতে হইবে না—"যদ্-গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" কলের যষ্টি নিজ গুণে আমাকে সেইদিকে লইয়া যাইবে। কাঙ্গালের ঠাকুর দয়াময়ের অতুল ভাণ্ডারে এরূপ যষ্টিও পাওয়া গিয়াছে। ইহা কি? ইহা হরিনাম। ইহাই অন্ধের বাঁশের যষ্টি। যোগ যাগ, জ্ঞান, বিজ্ঞানরূপ সুবর্ণময় যষ্টির মত ইহা হয় ত মূল্যবান্-কারুকার্য্য খচিত না হইতে পারে কিন্তু অন্ধের পক্ষে ইহা পরমোপকারী বন্ধু। কেননা ইহার জন্ম বেদ-গর্ভে। বেদের গুহ্য গর্ভ মথিত করিয়া যিনি এ সারধনকে বিলাই-য়াছেন তিনিই দয়াবান্। মূর্খ আমি, জ্ঞান কোথায় পাইব, চঞ্চল আমি, যোগ কিরূপে সাধন করিব, পাষাণ হৃদয় আমি, অহঙ্কৃত আমি ভক্তি কোথায় পাইব, তাই আসুন—প্রাণ ভরিয়া বলি "হরি বোল, হরি বোল" প্রাপ তাপ কাটিয়া

যাইবে, জীবন ধন্য হইবে। যেরূপ অধিকারী হইতে হয়, "নাম" আপনি আমাকে সেইরূপ অধিকারী করিয়া লইবে। স্বয়ং আমাকে কিছু করিয়া কর্ম্মিয়া লইতে হইবে না। নামের গুণে সকলই হইবে। স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব জ্ঞানের জ্বলন্ত কুণ্ডে, প্রেমের ক্ষীরে পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া অন্নের স্থালী হাতে লইয়া অন্ধকে ডাকিতেছেন আর বলিতেছেন—

"নাম সুধারস কে নিবি রে আয়।
এ যে, দেবের দুর্ল্লভ হরিনাম,
নামে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে যায়"
নামের গুণে বোবায় বলে,
পঙ্গু চলে, অন্ধে চখে দেখ্‌তে পায়"

তাই বলিতেছি, এমন জিনিষ আর নাই, এমন মাধুরী আর নাই, এমন আশার কথা আর নাই। আজ হয়ত যোগী অনধিকারী বলিয়া দুয়ার হইতে অন্ধকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন, হয়ত জ্ঞানী সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন নহে বলিয়া অন্ধকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিবেন, কিন্তু যিনি দয়াবান্, অনাথের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদে, তিনি তাহা পারিবেন-না। তাই অনাথ-বান্ধব পুরাণ-বক্তাগণ জ্ঞানের গুহ্য ভাণ্ডার বেদ-গর্ভ হইতে নামের যষ্টি বাহির করিয়া অন্ধের জন্য অন্ধশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সদাব্রতের দ্বার খুলিয়া জগতে মধুর নাম বিলাইয়াছেন। যদি কেহ অন্ধ থাক, ত এই দিকে আইস। এমন যষ্টি আর নাই, এমন আশ্রয় আর নাই, এমন পরমাত্মীয় আর নাই। আজ তোমার ব্রত তপস্যা আদি কিছু না থাকিলেও ওই যষ্টিই তোমাকে সুপথে চালাইয়া লইয়া যাইবে। ঘোর অন্ধকারে জ্বলন্ত আলোকের ন্যায় এই হরিনামই পথ দেখাইয়া, আপনা আপনি মোড় বাঁকিয়া তোমার লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। তুমি পাপী হও, তুমি পাষণ্ড হও, হরিনামই তোমায় ধীরে ধীরে পুণ্যবানের রাজ্যে, জ্ঞানীর আনন্দ-নিকেতনে, যোগীর নির্ম্মল-ধামে, ভক্তের প্রেম-নিকুঞ্জে লইয়া যাইবে। হরিনামের রাজ্যে অধিকারী অনধিকারীর বিচার নাই, যে আছে ক্ষুধিত, সেই এই হরিনাম সুধারস পান করুক, তৃপ্তি পাইবে। তুমি আমি পাপী বলিয়া এ রাজ্যে নিরাশ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা পাপী,আমরা অন্ধ, এই জন্যই ত হরিনাম আমাদের অবলম্বন। আমরা পীড়িত, এই জন্যইত ঔষধ আমাদের ভরসাস্থল। পাতকীরাই ত জগতে অধিক হরিনামের প্রচার করিয়াছে। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা পারেন নাই। গৌরাঙ্গদেব "হ" এই অক্ষরটি উচ্চারণ করিতে করিতেই প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিত, আর "রি" উচ্চারণ হইত না। সুতরাং তিনি জীবনে কয়টা হরি-নাম উচ্চারণ করিয়াছেন! যবন হরিদাসই ত লক্ষ লক্ষ বার হরিনাম জপিয়া বজ্রনির্ঘোষে জগতে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, পাপী জগাই মাধাই তো ভৈরব নিনাদে হরি-বোল বলিয়া দেশকে সচেতন করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি—হরিনাম পাপীরই আশা-ভরসা স্থল, কেননা ইহা "পতিতপাবন"। হরি "শব্দেরই" এমনি গুণ যে উচ্চারিত হইলেই ইহা দেহ, মন, আত্মাকে পবিত্র করে। এ মধুর শব্দ হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রীতে বাজিয়া কিরূপ

স্নায়ব প্রক্রিয়ায় ভিতরে গিয়া ক্রিয়া করে, সে গুরু গভীর শব্দবিজ্ঞানের কথা আজ আলোচনা করিব না। তবে সংক্ষেপে কয়েকটী আশঙ্কার নিরাস করিব। কেহ কেহ বলেন, কেবল মুখে হরি হরি বলিলে যদি জগতের সদ্‌গতি হইত,তবে চিনি চিনি বলিলেও মুখ মিষ্ট হইত। যদি মুখ মিষ্ট করিতে হয়, যদি উদর পূর্ত্তি করিতে হয়, তবে "চিনি" না খাইলে কেবল "চিনি চিনি" বলিলে কিছু হইবে না। যদি দেহ মন আত্মাকে পবিত্র করিতে হয়, তবে কেবল "হরি" বলিলে হইবে না এই শব্দের প্রতি-পাদ্য পদার্থকে অনুভব করিতে হইবে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে, নহিলে কেবল বাহিরে শব্দোচ্চারণ করিলে কি হইবে। চিনি থাকিল দূরে, হরি থাকিলেন বাহিরে, তাঁহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধই নাই, তবে তোমাতে কেমন করিয়া তাহার ক্রিয়া হইবে? এ কথা যাঁহারা বলেন, আমি তাঁহাদের সংক্ষেপে কিছু উত্তর দিব। প্রথমে বলা উচিত যে কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা পদার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী কেবল বুঝিবার সুবিধা হয়। পদার্থ সাধনে যুক্তি চাই, প্রমাণ চাই। যদি কোন প্রমাণ না দিয়া, যুক্তি না দিয়া কেবল দৃষ্টান্তের বলেই হরিনামোচ্চারণের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়, তাহা হইলে সে চেষ্টা বৃথা। আমিও ঠিক তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দিয়া নামোচ্চারণের সারবত্তা বুঝাইব। যেমন দেখ, তোমার সম্মুখে একটী তেঁতুল গাছ রহিয়াছে। তেঁতুল গাছে বসিয়া বানরে তেঁতুল খাইতেছে, তুমি কিছু তেঁতুল খাইতেছ না, তোমার সহিত তেঁতুলের কোন সম্বন্ধই নাই, তথাপি বানরের তেঁতুল খাওয়া দেখিয়া তোমার মুখে জল আসে কেন? তোমার কাছে কেহ যদি কুলের আচার, আমের আচারের কথা বলে, তবে তোমার মুখে জল আসে কেন? তুমি ত আচার খাইতেছ না, তোমার মুখে ত আচার নাই, তবে আচার এই শব্দ শুনিয়া তোমার মুখ জল পূর্ণ হয় কেন? বাহিরে থাকিল আচার, কেবল শব্দোচ্চারণে তোমাতে ক্রিয়া হইল কেন? কি জানি আচার এই শব্দের কি গুণ, যে শুনিলে বা বলিলেই মুখে জল আসে। তেঁতুল ও আচার তুমি কখন না কখন আস্বাদ করিয়া থাকিবে, তাই আজ তাহা স্মরণ বা দর্শন মাত্রে তোমার অস্থিমজ্জা ও ভাবগত পূর্ব্বসংস্কার জাগ্রত হইয়া নৃত্য করিয়া উঠিল। অমনই শক্তির আবেগে স্নায়ুরাশি স্বভাব সূত্রে ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাই তোমার মুখে জল আসিল। এ দৃষ্টান্তে আমি বিরুদ্ধপক্ষকে নিরাশ করিলাম বটে, কিন্তু মনের কথা—কাজের কথা বলা হইল না। মনে কর তুমি কখনও সিংহের ভীম গর্জ্জন শুন নাই, সুতরাং তাহার সংস্কারও তোমার নাই, কিন্তু অকস্মাৎ যদি গিরিগহনে সেই ধ্বনি তুমি শুনিতে পাও, তবে অমনি ভয়ে বিকল ও মূর্চ্ছিত হও কেন? সেই শব্দকারী সিংহকে স্মরণ করিয়া? (না, তুমি তো কখন সিংহ দেখ নাই, সিংহের কথাও শুন নাই) অথবা শব্দের কোন অর্থ বুঝিয়া? না; তাহাও নহে, কেননা, তাহার কোন অর্থই নাই। প্রত্যুত সিংহরবের স্বভাবগত শক্তির দ্বারাই তোমার শরীর-মনের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থার

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমার বুদ্ধি তাহা বুঝে না বটে, কিন্তু তোমার শরীর-মনাদির তন্মাত্রগতির সহিত বাহিরের উৎকট শব্দের পরিচয় আছে। সেই রূপ জানিবে, হরি এই শব্দেরই কি মহিমা, যে উচ্চারণ করিলেই শুষ্ক মুখে জল আসে, তাপিত প্রাণে শীতল শান্তিময় বারিধারা প্রবাহিত হয়। পাষাণ ভেদ করিয়া অমৃতের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। তাই নাম সাধক গাহিয়াছেন—

হরিনাম-কি মধুর নাম।
নাম শুনে যে জুড়ালো রে প্রাণ ॥
ও সে হরি নামের মোহন গুণে
গলে যায় কঠিন পাষাণ,
আর বলব কি নামের মহিমা
মরু ভূমে ডাকে বাণ ॥

কেহ কেহ বলেন—ভক্তি পূর্ব্বক হরিনাম না করিলে কোন ফল হয় না, যাহারা এ কথা বলেন—তাঁহারা ভ্রান্ত। ভক্তি বহু দুরারাধ্য তপস্যার সাধ্য ফলস্বরূপ। তাহা কখন হরিনামে গোঁজামিলন স্বরূপ হইতে পারে না। হরিনাম দ্বারাই ভক্তিকে পাওয়া যায়। যদি ভক্তিই থাকিল, তবে হরি-নামের প্রয়োজন কি? অতএব ভক্তি পূর্ব্বকই হউক আর অভক্তি পূর্ব্বকই হউক "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" হরিনাম করিলেই পাপীর উদ্ধার হইবে। হরি শব্দেরই এমনি প্রকৃতি নিহিত গুণ আছে, যাহাতে পাপ তাপ আপনা আপনিই ছুটিয়া যায়। অনেকেই ভাবিতে পারেন, এ ক্ষুদ্র অক্ষর দুইটীর এমন কি শক্তি আছে, যাহাতে জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত পাপ তাপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। ইহা ত কখনই সম্ভব নহে। ইহার উত্তরে আমি বলি, বস্তুর আকারের উপরে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহার শক্তির উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। "হরি" এই কথাটির আকার ক্ষুদ্র হইতে পারে কিন্তু তাহার শক্তি মহা তেজস্বিনী। নাম ব্রহ্ম স্বরূপ। একটা দৃষ্টান্ত দেখ। রাত্রিকালে প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে নিবিড় অন্ধকার জমিয়াছে। তাহার বিনাশ সাধন করিতে যদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থূলকায় হস্তীযুগ নিযুক্ত কর, তথাপি তাহার এক কণিকাও বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু একটী ক্ষুদ্র দীপশলাকা জ্বাল দেখি, দেখিবে, সেই ক্ষুদ্র দীপ শিখা সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা-ব্যাপী অন্ধকার স্তূপকে কোথায় দূরীভূত করিয়া দিয়াছে। দীপ-শিখার আকার ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, তাহার প্রকাশ-শক্তি নাকি মহাতীব্র, তাই অন্ধকার কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সেই রূপ হরিনামের দীপ শিখায় পাপান্ধকার কোথায় উড়িয়া যায়। হরিনামের জ্বলন্ত অগ্নিতে পাপ তাপ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। কেননা হরিনাম অপৌরুষেয় সিদ্ধ শব্দ। তাই বলি—হরিনামের আকার ক্ষুদ্র হইলেত্ত তাহার শক্তি মহীয়সী। আমরা নাকি স্থূল-বুদ্ধি; তাই হরিনামের সূক্ষ্ম শক্তি না বুঝিয়া তাহার সাফল্যের প্রতি অবিশ্বাস করি। হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউল (বটিকা) ক্ষুদ্র হইলেও তাহা যে মহারোগ-বিনাশন, তাহা আমরা বুঝিনা। তাই এলোপ্যাথির প্রকাণ্ড ২ বোতলের তরল ঔষধ আমরা ঢগ ২ করিয়া গিলিতে চাই। তাহা তিক্ত হউক, কষ্টকর হউক, তথাপি তাহা সাধ

করিয়া গিলিব, কেননা তাহার বোতল প্রকাণ্ড, তাহার ঔষধের পরিমাণ প্রকাণ্ড, সে বোতলে যে লেবেল আছে তাহাও প্রকাণ্ড, তাহার সকলই প্রকাণ্ডতাময়, সকলই আড়ম্বরময়। তাই তাহার উপর বিশ্বাস আছে। তাই এমন সুখদ সুমিষ্ট হোমিওপ্যাথির বড়ি ছাড়িয়া ঐ ঔষধ গুলা গিলিতে চাই। আমরাও সেই রূপ ভবরোগাক্রান্ত। হরিনামের ক্ষুদ্র বটিকাই আমাদের পক্ষে এখন সুখ সেব্য ও উপকারী। জ্ঞানযোগ, এলোপ্যাথির মত বড় কৃচ্ছ্র সেব্য। অতএব তাহা উপকারী হইলেও যাহা সুখ-সাধ্য উপায় তাহা ছাড়ি কেন?

পুর্ব্বেই বলিয়াছি, শব্দের প্রকৃতিগত এমন কোন শক্তি আছে, যে অর্থ না বুঝিলেও ভাবে না ডুবিলেও সে শক্তি মনে ক্রিয়া করে, মনকে মাতাইতে পারে, গলাইয়া তাহাকে ছাঁচে ঢালিতে পারে। অর্থ ছাড়া শব্দের এ স্বাভাবিক গুণ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। তোমার সম্মুখে যদি রণবাদ্য বাজিয়া উঠে, তুমি মহা-দুর্ব্বল সিং হওনা কেন, শব্দের গুণে তোমার শিরায় শিরায় রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিবে, তোমাকে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা দিবেই দিবে। ভীমদর্শন বিষধর তোমাকে গর্জ্জিয়া কামড়াইতে আসিতেছে, এমন সময় যদি মোহন সুরে বাঁশি বাজাও, সর্প স্তব্ধ হইয়া শুনিবে। তাহার হিংসা-প্রবৃত্তি কোথায় উড়িয়া যাইবে। সর্প কিছু আর তানসানের প্রপৌত্র নহে যে বংশীধ্বনির সুরতাল লয় বুঝিয়া সে মোহিত হইতেছে। কোন ভাব সে বুঝিল না, কিন্তু শব্দের প্রকৃতি নিহিত এমনই শক্তি, যে তাহাতেই সে মুগ্ধ-পাগল হইয়া গেল। সামান্য বংশীধ্বনিতে যদি সর্পের হিংসা প্রবৃত্তি উড়িয়া যাইতে পারে, তবে হরিণামের জগদ্‌ভুলান উন্মাদময় বাঁশরী বাজিলে হৃদয়ের সাংসারিক দুষ্প্রবৃত্তি রাজি ছিন্ন ভিন্ন হইবে না কেন? উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিৎ স্বরে হরিনামের মধুর গীতি পাষাণ্ডকে ভুলাইতে পারে, লৌহকে গলাইতে পারে, শ্মশানে জীবন শক্তির তুফান ছুটাইতে পারে। তাই বলিতেছি, এই হরিনামই অন্ধের যষ্টি। "হরি" এই কথাটি বাঁধাসুরের মত সিদ্ধ-শব্দ। সহস্র সহস্র সাধকের হৃদয়-সরোবর ভেদ করিয়া এ অপূর্ব্ব কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধকের যাহা হৃদয়ের সামগ্রী, বিরলে বসিয়া যে গুপ্ত ধনের মাধুরী-ধারা সাধক পান করিতেন, প্রেমে বিভোর হইয়া নারদ ঋষি যে গাথা গাহিয়া আপনার রসে আপনি মাতিয়া ত্রিজগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন, মহাদেব পঞ্চমুখে গান করিয়া যে অনন্ত সঙ্গীত স্রোতে মগ্ন হইয়া অকাণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করিতে ২ ত্রিতাপতপ্ত জীবকে শান্তির রসে ডুবাইয়াছিলেন, সে পরম গুহ্য ধন আজ আমাদের মত অন্ধের জন্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে। তুমি জ্ঞানী, তোমার কথা হইতেছে না, তুমি যোগী, দুরে সরিয়া দাঁড়াও, তুমি পরম ভক্ত, দুর্ল্লভ পরাভক্তি তুমি পাইয়াছ, তুমিও পথ ছাড়িয়া দাও, ঐ যে গরীব, ঐ যে জন্মান্ধ, ঐ যে ছিন্ন বিছিন্ন কন্থা কাঁধে লইয়া দীন বেশে দুয়ারে ২ ফিরিতেছে, উহাকে দীননাথের দরবারে আসিতে দাও, সদাব্রতের অন্নসত্রে প্রাণ ভরিয়া তৈয়ারি অন্ন খাইতে দাও, চিরবিশুষ্ক হৃদয় কাননে বসন্তের মল্লিকা মালতী ফুল ফুটিতে

দাও, বাধা দিওনা, বুদ্ধিভেদ করিও না।

বুঝিলাম—ভগবানের নামই অন্ধের যষ্টি। এমন যষ্টি আর নাই। ইহা আপনা আপনি মোড় বাঁকিয়া অন্ধকে সুপথে লইয়া যায়। যেমন শিক্ষিত ঘোড়ার উপর কোন একটি বালককে বসাইয়া দিলে, সে আপনা আপনি ঠিক রাস্তা দিয়া গন্তব্য স্থানে পোঁছাইয়া দেয়, সেই রূপ এ লাঠিও অন্ধকে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত করিবে। পশ্চিমোত্তর দেশে আপনারা বড় বড় কূপ দেখিয়াছেন। সেই কূপ হইতে যখন ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয়, তখন কূপ হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত একটা জল প্রণালী কাটিতে হয়। সেই জল প্রণালী দিয়া কূপোদ্ধৃত জল প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রে পড়ে। ক্ষেত্রে পতিত হইয়া সে জল ক্ষেত্রে রোপিত শস্যের পুষ্টি সাধন করে সত্য, কিন্তু প্রণালী দিয়া যাইবার সময় প্রণালীর ধারে ২ যে সমস্ত তৃণাদি থাকে, তাহাদেরও মূলদেশে রস সিঞ্চন না করিয়া যাইতে পারে না। সেই রূপ হরিনামও অন্ধপথিককে হরিপাদ-পদ্মরূপ লক্ষ্য স্থলে ধীরে ধীরে লইয়া যাইবার সময় পথস্থিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, সাধনা, এসমস্তের পাদ-মূলেও রস সিঞ্চন করিয়া যান। রসের পরিপুষ্টিতে যেমন ঘাস গুলি নব নধর ভাবে গজাইয়া উঠে, সেই রূপ হরিনামের শীতল বারি পাইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আদিও ধীরে ২ ফুটিতে থাকে। তাই বলি—নামের বল বড় বল। নামই বস্তুর প্রাপক। বড়লোকের নাম শুনিয়াই দীন দুঃখী তাঁহার কাছে যায়। নাম ধরিয়াই লোকে তাঁহার বাড়ি চিনিয়া লয়। "রামনামের" বলেই হনূমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাগর পার হইতে স্বয়ং রামচন্দ্রকে বহু কষ্টসাধ্য সেতু বাঁধিতে হইয়াছিল। তাই বলি—নাম প্রভু অপেক্ষাও বড়। তাই রুক্মিনীর তুলাদণ্ডে তুলসীপত্রে লিখিত হরিনাম সমস্ত দ্রব্য সম্ভার অপেক্ষা গুরু হইয়াছিল। নাম বস্তু হইতেও ব্যাপক। বস্তুর নাম যতদূর ছুটিতে পারে, বস্তু ততদূর যাইতে পারে না। আমার এই তুচ্ছ শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন নাম সংবাদপত্রে পড়িয়া হয়ত অনেকেই চেনেন, কিন্তু এ ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ কয় জন লোক চিনেন? তাই বলি—নাম বস্তু হইতেও ব্যাপক—বড়। কাতর কণ্ঠে নাম ডাকিলে প্রভুর আসন টলে, নামের বলেই নিভৃত গুহ্য-গুহা-শায়ীকে টানিয়া বাহির করিতে পারা যায়। নামের তেজেই বৈকুণ্ঠ পুরী ভেদ করিয়া তাঁহার দিব্য বিভা এ জগতে বিকীর্ণ হয়। যাঁহার সহিত কখনও পরিচয় নাই, কখনও জানা শুনা নাই, কেবল নামের পরিচয় পাইয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছি, জগতের পরিচিত বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া সেই অচেনা অজানা পথে ছুটিতেছি, তিনি কি আশা ভরসা দিবেন না; যিনি করুণার গঙ্গাজলে অন্ধ বিল্বমঙ্গলের দুইটি চক্ষু ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, সেই পদ্মপলাশলোচন যে কাহাকেও নিরাশ করিবেন, এমনত মনে হয় না। তাই বলি অন্ধ! তোমারও আশা আছে। যিনি হরি নামামৃত বিহ্বল অন্ধ বিল্বমঙ্গলের হস্ত ধরিয়া নিত্য রূপ দেখাইয়াছিলেন, জীব! বিল্বমঙ্গলের ন্যায় তোমাকে অন্ধ দেখিয়া তিনি কৃপা পূর্ব্বক নামের যষ্টি দান করিয়াছেন; উহা অবলম্বন কর।

তুমি দেখিতে পাও আর নাই পাও, ঐ যষ্টির অগ্রভাগ ধরিয়া বিল্বমঙ্গলের রাখাল বালকের ন্যায় তিনি তোমাকে তাঁহার নিত্য ধামে লইয়া যাইবেন। হরি বলিতে আলস্য করিও না, সময় থাকিতে নাম অবলম্বন কর। নামই **"অন্ধের যষ্টি"**। প্রাণ ভরিয়া বল **"হরিবোল,"** সাধ মিটাইয়া বল "হরিবোল," বদন ভরিয়া বল "হরিবোল," বাহু তুলিয়া বল "হরিবোল," আনন্দে মাতিয়া বল হরি বোল, সকলে মিলিয়া বল হরিবোল, বল হরি হরি বোল, হরি হরি হরি বোল, হরি বোল! ওঁ হরি ওঁ।

পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

---

## যাত্রা।

সে অঞ্চল জুড়ি পড়ে গেছে সাড়া
সবাকার মনস্কাম;
ঠাকুর বাড়ীর কর্ত্তাদের সাথে
যাইবারে কাশীধাম।
হেন কালে আমি সঙ্কুচিত চিত্তে
বৈদ্যনাথ সূত্রধর;
"অধম দাসেরে নিয়ে চল প্রভু"
কহি জুড়ি দুই কর।
বৃদ্ধের নয়নে দেখি কাতরতা
অনুরাগ প্রাণভরা,
কর্ত্তা মহাশয় কহিলা আদরে
"বাপু চলে এস ত্বরা।"
শুভদিন দেখি নৌকা দিল ছাড়ি
জয় বিশ্বেশ্বর বলে,
কতবা নগর গ্রাম উপগ্রাম
নদ নদী বাহি' চলে।
যাত্রী সবে মিলি নানা গল্পচ্ছলে
কাটায় প্রবাস-কাল,
বৈদ্যনাথ শুধু বসি এক মনে
চিন্তে সেই বিশ্বপাল।
কত দিনে হায় দেখিবে সে রূপ
জটাজুট বিভূষিত,
করেতে ত্রিশূল শিরে শশীকলা
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিহিত।
ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ আবেগে
হৃদয় নাচিয়া উঠে,
অশ্রু-ধারা বহে শীর্ণ গণ্ড বহি
প্রেম-ধারা যেন ছুটে।
কত দিন পরে উত্তরিল তরি
দশ-অশ্বমেধ ঘাটে,
স্নানে পূত হয়ে যত নর-নারী
চলেছে মন্দির বাটে।
বৃদ্ধ বৈদ্যনাথ কম্পিত চরণে
চলেছে সবার পাছে,
পুলক সঞ্চারে দেহ রোমাঞ্চিত,
সংসার ভুলিয়া গেছে।
যে মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে বিরাজে
বহু বহু বর্ষ ধরি,—
অহো কি সৌভাগ্য এখনি সে রূপ
দেখিবে নয়ন ভরি'।
হেথা বিশ্বনাথ সুবর্ণ মন্দিরে
লিঙ্গ-রূপে বিরাজিত,

একে একে সবে　　লভি' দরশন
　　হইলা কৃতার্থকৃত।
বৈদ্যনাথ শুধু　　চুপ করে আছে
　　সব হয়ে গেছে গোল,
মানসে তাহার　　অঙ্কিত যে রূপ
　　একি তাঁর সমতুল।
পুতুলের প্রায়　　রহে দাঁড়াইয়া
　　হাতে পূজা উপচার,
কহিলা ঠাকুর　　"ওহে বৈদ্যনাথ
　　একি তব ব্যবহার ?"
"নিষ্ফল এ যাত্রা　　হইয়াছে মোর
　　আশুতোষ মোর প্রতি বাম,
হায় গো ঠাকুর　　এই কি দেখিতে
　　এসেছিনু কাশীধাম ?"
বৃদ্ধের পরাণ　　ঘাত-প্রতিঘাতে
　　হয়ে গেছে নিষ্পেষিত,
বৈদ্যনাথ সেথা　　লিঙ্গ-পাদমূলে
　　লুটাইল সংজ্ঞাহত।
সরল ভক্তেরে　　নিজে আশুতোষ
　　নিলা তুলি কোলে করি,—
দেহ রাখি তার　　মণিকর্ণিকায়
　　যাত্রী সবে গেল ফিরি'।

শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

# বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য।

পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমুলার সাহেব ভাষার বিভিন্নতা উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ এ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই, এই জন্য তাঁহার মত সত্য বলিয়া বোধ হয়। স্বরের ব্যতিক্রম বা বৈলক্ষণ্য ও উচ্চারণ ভেদ ভাষার বিভিন্নতা উৎপত্তির প্রধান কারণ। তাহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আরও অনেক হেতু প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটী প্রধান বলিয়া এখানে বিবৃত করা হইল। বাস্তবিক এই দুইটী হেতু যে ভাষার বিভিন্নতা উৎপন্ন করে, এবিষয় সম্বন্ধে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া বুঝিলে তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। এক প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষা হইতে বঙ্গ ও হিন্দি-ভাষার উৎপত্তি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের বিভিন্নতা ও প্রভেদ এত অধিক যে ইহাদিগের উৎপত্তি স্থান এক, ইহা সহজে বোধগম্য হয় না। তবে উভয় ভাষায় অনেক বাক্য ও শব্দ একরূপ বলিয়া ইহাদিগের পরস্পরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে—বুঝিতে পারা যায়। যদি কোন পর্য্যটক হুগলী হইতে যাত্রা করিয়া বর্দ্ধমানের মধ্য দিয়া বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলাদ্বয়ের সীমানা অতিক্রম পূর্ব্বক ছোটনাগপুর প্রদেশে উপনীত হযেন, এবং তথা হইতে যাত্রা করিয়া হাজারিবাগের মধ্য দিয়া গয়াভিমুখে যান। পরে তথায় উপনীত হইয়া পাটনাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং তথা হইতে বারাণসী দিকে গমন করেন। তাহা হইলে তিনি বঙ্গ ও হিন্দি ভাষা কি প্রকার বিভিন্ন ও পৃথক হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন। যখন তিনি হুগলী হইতে যাত্রা করিবেন, তখন তিনি বিশুদ্ধ বঙ্গ-ভাষায় লোকেরা কথাবার্ত্তা কহিতেছে—শ্রবণ করিবেন। বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া যাহা তিনি শ্রুত হইবেন, তাহাও বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা, তবে কিছু কিছু প্রাদেশিক

শব্দ তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে দেখিবেন এবং লোকদিগের স্বর বৈলক্ষণ্য ও উচ্চারণ-ভেদ কিছু কিছু ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিবেন, বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া যত তিনি বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলা দিকে অগ্রসর হইবেন, তত উক্ত ভাষার অনেক পরিমাণে প্রাদেশিক শব্দ মিশ্রিত দেখিবেন, এবং ব্যক্তিদিগের শব্দ উচ্চারণের বিভিন্নতা ও তাহাদিগের স্বর ব্যতিক্রম হেতু ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,তাহা তাহার বোধগম্য হইবে। পরে তিনি ছোট-নাগপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়া মানভূমে উপনীত হইয়া দেখিবেন, যে আরও অধিক পরিমাণে ভাষার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। মানভূম পরিত্যাগ করিয়া হাজারিবাগাভিমুখে যাত্রা করিলে এমত স্থানে উপস্থিত হইবেন, যথাকার লোকেরা এরূপ এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, যাহা না বাঙ্গালা, না হিন্দি। পরে হাজারি-বাগ হইতে গয়ার দিকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখি-বেন, তথায় যে ভাষা কথিত হয়, তাহা বিশুদ্ধ হিন্দি নহে। তথাকার লোকদিগের শব্দ উচ্চারণ প্রথা ও স্বরভঙ্গি বঙ্গবাসীদিগের ন্যায় এবং অনেক বঙ্গ-ভাষার শব্দ তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। পরে পাটনাভিমুখে যাত্রা করিয়া যত অগ্রবর্ত্তী হইবেন, তত লোকদিগকে এরূপ ভাষায় কথা কহিতে শুনিবেন, যাহা বিশুদ্ধ হিন্দি না হইলেও তাহা একরূপ পরিবর্ত্তিত হিন্দিভাষা, এবং ক্রমে বারাণসীতে উত্তীর্ণ হইয়া বিশুদ্ধ হিন্দি শুনিতে পাইবেন। আবার যদি কোন পর্য্যটক হুগলী হইতে পর্য্যটন আরম্ভ করিয়া বাঁকুড়া দিয়া উড়িষ্যাভিমুখে গমন করেন, তাহা হইলে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গভাষা উড়িয়াভাষা উৎপন্ন করিয়াছে, তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। পরিবর্ত্তিত বঙ্গভাষা উড়িয়া-ভাষা। ইহা বঙ্গভাষার অপ-ভ্রংশ বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হওয়া যায় না। বঙ্গভাষায় শব্দ সকল বিভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হইয়া অন্য রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া ভাষায় পরিণত হইয়াছে। উড়িয়া-ভাষা অপভ্রষ্ট বঙ্গ-ভাষা। কিন্তু ইহা এক্ষণে স্বতন্ত্র ভাষায় পরিগণিত হইয়াছে। এ ভাষার বর্ণমালা, বঙ্গ-ভাষার ন্যায়, কেবল আকার প্রভেদ মাত্র।

পর্য্যটকেরা বহুদর্শন দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, গৃহে উপবেশন করিয়া কেবল গ্রন্থ পাঠে তাহা হয় না। উপরোক্ত জেলার পর্য্যটকদ্বয় উপরোক্ত ভাবে পর্য্যটন করিয়া উচ্চারণ ভেদে ও স্বর বৈলক্ষণ্যে যে ভাষা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে এবং উক্ত কারণদ্বয়ের দ্বারা যে ভাষার উৎপত্তি হয়, তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে সক্ষম হইবেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভাষা বঙ্গভাষা। কিন্তু উচ্চারণের প্রভেদ হেতু ও স্বর বৈলক্ষণ্য জন্য বঙ্গভাষা তথায় কিরূপ বিকৃতি লাভ করি-য়াছে, তাহা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বিক্রমপুরে এমত স্থান আছে,যথাকার লোকেরা তালব্য "শ" উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহা-দিগের "শ"য়ের উচ্চারণ 'হ' এবং "খ"য়ের উচ্চারণ 'ক'। যে ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগের কথা কখন শোনেন নাই, যদি তিনি কখন চট্ট-গ্রামে গমন করেন। তাহা হইলে তিনি বাষ্পীয় পোত হইতে কিম্বা বাষ্পীয় যান হইতে অবতরণ

করিয়া তথাকার লোকের কথা একবারে বুঝিতে পারিবেন না। যদিও লোকেরা বঙ্গ-ভাষার কথা কহিতেছে, তথাপি তাহার বোধ হইবে সে ভাষা যেন কোন নূতন ও স্বতন্ত্র ভাষা। পরে কিছুদিন তথায় বাস করিলে তবে তাহার সে ভ্রম দূর হইবে।

লেখক কার্য্যোপলক্ষে চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন। তিনি বাষ্পীয় পোত হইতে অবতরণ করিয়া লোকদিগের কথা একবারে বুঝিতে সক্ষম হয়েন নাই। পরে তথায় থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং তাহাদিগের ভাষা যে বঙ্গভাষা, তাহা তাহার বোধগম্য হইয়াছিল।

লাটিন, পারস্য ও সংস্কৃত-ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা ঠিক একরূপ, তবে কেবল ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ বলিয়া বোধ হয়। যথা—

| সংস্কৃত | পারস্য | লাটিন |
|---|---|---|
| পিতৃ | পার্দ্র | পেতার |
| স্থা | আইস্তাদ | স্তো |
| দ্ব | দো | দুও |

উপরে অতি অল্প শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শিত হইল। কিন্তু এরূপ অনেক শব্দ আছে। উক্ত কয়েক ভাষায় একরূপ শব্দ দেখিয়া বোধ হয়, এক সাধারণ ভাষা হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ এক ভাষা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রথা অনুসারে উচ্চারিত ও কথিত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

উচ্চারণ ভেদ স্বর বৈলক্ষণ্য দ্বারা প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গভাষারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। দেশের জলবায়ু দেশের লোকের উচ্চারণ ও স্বরের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের ও চট্ট-গ্রামের, উড়িষ্যার ও আসামের জলবায়ু বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সেজন্য বোধ হয় তাহাদিগের উচ্চারণ ও কণ্ঠ-স্বর নিকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে।

উপরোক্ত প্রদেশ সমূহের যে জলবায়ু নিকৃষ্ট বলা হইল, তাহা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নহে, উহারা উচ্চারণ ও স্বরের উৎকৃষ্টতা সম্পাদনে অনুকুল নহে সেই অর্থে এখানে নিকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা হইল। পশ্চিমবঙ্গে গাঙ্গা মাতৃক প্রদেশীয় লোকদিগের উচ্চারণ পরিস্কৃত ও কণ্ঠস্বর সুস্রাব্য, বোধ হয় উক্ত স্থানের বায়ু ও ভাগী-রথীর বারি এই দুই বিষয় সম্বন্ধে অনুকুল।

অতি পুরাকালে যে বঙ্গদেশে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল,ইহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সে সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম দেশে প্রাকৃত সংস্কৃত-ভাষায় কথাবার্ত্তা হইত। সেই দেশের লোক বঙ্গে আসিয়া অধিবাস করে, ইহা পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়। কোন্ সময়ে যে প্রাকৃত সংস্কৃত বঙ্গভাষায় পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। জয়দেব গোস্বামী চৈতন্যদেবের পূর্ব্বকার লোক। তিনি গীতগোবিন্দ রচনা করেন তাহা সংস্কৃত-ভাষায়, সে সংস্কৃত কোমল, সেই গীতগোবিন্দ পাঠে বুঝা যায় যে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, সে সময় মুসলমানের রাজত্ব। তখন যে বাঙ্গালা

ভাষায় দেশে কথাবার্ত্তা হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালসেন আদি হিন্দু রাজারা যখন দেশে রাজত্ব করিতেন, তখন দেশে কি ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। তাহাদিগের তাম্রলিপি আদি সংস্কৃত-ভাষায় লেখা হইত, দেখা যায়।

চৈতন্যদেবের সময়ে দেশে বাঙ্গলা-ভাষায় কথাবার্ত্তা হইত, জানা যায়। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে কোন্ বঙ্গভাষা গ্রন্থাদি লিখিত হইত তাহার প্রমাণ নাই। তিনি গীতগোবিন্দের শ্লোক লইয়া কীর্ত্তন করিতেন। তাহার পরে বৈষ্ণব কবিগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব কবিদিগের দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য সূচিত হয়। কিন্তু তখন গদ্যতে গ্রন্থ লিখিত হইত না। সমস্তই পদ্যতে।

সাহিত্যই ভাষার ঔৎকর্ষসাধন হইয়া থাকে। অনেক দিন ধরিয়া বঙ্গভাষায় কেবল পদ্যে গ্রন্থ লিখিত হইত। বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থ পদ্যময়। তাহাদিগের গ্রন্থে মৈথিলি ভাষার ও যাবনিক ভাষার শব্দ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কবি ভারতচন্দ্রের সময়ই বঙ্গ-সাহিত্য অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্টতা লাভ করে। মহাভারত ও রামায়ণ পদ্যে অনুবাদিত হয়। এ সময়ের বহুদিন পরে প্রভাকর ও ভাস্কর সম্পাদকেরা পদ্যে সম্বাদ পত্র লিখিতেন। পূর্ব্বে বঙ্গ-ভাষায় গদ্য গ্রন্থ ছিল না। রাজা রামমোহন রায় গদ্যে পুস্তক লিখিয়াছেন সেই, সময়ে হইতে বা তৎপূর্ব্ব হইতে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের বঙ্গভাষা শিক্ষার জন্য এক পণ্ডিত একখানি গদ্যগ্রন্থ লেখেন। ইহার বাঙ্গালা অতি দুর্ব্বোধ ও কঠিন।

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় হইতে বহুল পরিমাণে গদ্যে গ্রন্থ লেখা আরম্ভ হয়। তিনি নিজেই অনেক গ্রন্থ গদ্যে লিখিয়াছিলেন। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত ৺তারাশঙ্কর শর্ম্মা তাঁহার সমসাময়িক লোক। তাঁহারা যে সব পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন,তৎসমস্তই গদ্যে। ৺অক্ষয় দত্ত বঙ্গ-সাহিত্যের সেবক ছিলেন। তাঁহার সেবায় বঙ্গ-সাহিত্য অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছিল। কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুগ্রহে এই সময় মহাভারত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহা বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। ইতিপূর্ব্বে কাশীরাম দাসের অনুবাদিত পদ্য মহাভারত ভিন্ন বঙ্গে উহার গদ্য অনুবাদ ছিল না। কাশীরাম দাসের মহাভারতের মূল ঘটনা কেবল সংক্ষেপে বিবৃত। আবার তাঁহার উক্ত গ্রন্থে সকপোল-কল্পিত অনেক গল্পও সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতে জনা চিত্র অতি মনোহর, কিন্তু ইহা মূল মহাভারতে নাই। যদিও কাশীরাম দাসের মহাভারতের বঙ্গ অনুবাদ মূল গ্রন্থের সম্যক অনুবাদ নহে, উহার আংশিক অনুবাদ, তথাপি মহাভারতের মূল ঘটনা জানিবার অন্য উপায় ছিল না বলিয়া বাঙ্গালী সকলে এই গ্রন্থ অতি আগ্রহ ও যত্নসহকারে পাঠ করিত। কলু ঘানিগাছে চাপিয়া, ও গ্রাম্য দোকানদারগণ অপরাহ্নে কার্য্যে অবসর পাইয়া বিপণির এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সুর করিয়া উহা পাঠ করিত। কাশীরাম দাসের দ্বারা বঙ্গবাসীরা বিশেষভাবে উপকৃত।

কালীসিংহের হুতোম পেঁচার নক্‌সা ও টেঁকচাঁদ বাবুর আলালের ঘরের দুলাল বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্যময় গ্রন্থ সকল বঙ্গ-সাহিত্যের অপূর্ব্ব বস্তু। এই সময়ে কবিবর ৺মাইকেল মধুস্থদন দত্তের গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হয়। তাহার মেঘনাদ বধ কাব্য বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অতুলনীয় রত্ন। তিনি বঙ্গের মিল্টন। তিনি যদি কেবল মেঘনাদ বধ লিখিয়া যাইতেন, আর অন্য কোন গ্রন্থ না লিখিতেন, তাহা হইলেও এই গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺দীনবন্ধু মিত্র ও ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। অধুনা যে ধরণে উপন্যাস লেখা হয়, তাহা বঙ্কিমবাবুর দ্বারা প্রচলিত। বঙ্কিমবাবু শেষজীবনে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণ-চরিত অতি উপাদেয় গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় অতি চিন্তাশীল লেখক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ সমূহ বঙ্গ-ভাষার অমূল্য রত্ন। রমেশচন্দ্র দত্তও সাহিত্যসেবক ছিলেন। এবং ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তজ্জন্য অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় সুলভ মূল্যে সম্বাদপত্র প্রকাশের প্রথম পথ প্রদর্শক। ইতিপূর্ব্বে ৺কেশব সেন মহাশয়ের দ্বারা সুলভ মূল্যে সুলভ-সমাচার নামে একখানি সম্বাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা সুচারুভাবে পরিচালিত হইত না। যোগেন্দ্রবাবু যেরূপ পারদর্শীতা সহকারে তাঁহার কাগজ পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেরূপ কেশববাবু পারেন নাই। শেষোক্ত বাবুর কাগজ অল্পদিন মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু যোগেন্দ্রবাবুর পরিশ্রমে, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যে এবং পারদর্শীতা হেতু বঙ্গবাসী দেশ-দেশান্তরে খ্যাত। ইহার স্থায়ীত্বের ভিত্তি অটল ও অচল।

তিনি সাহিত্য-সেবায় চির-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে যে সব কার্য্য করিয়াছেন,তাহা বর্ণনাতীত। তাহার কর্ত্তৃক পুরাণ সকল বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদিত হইয়া দেশের যে কি উপকার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই সকল অনুবাদ দ্বারা যেরূপ সাহিত্যোন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেইরূপ দেশের লোকের হিন্দুধর্ম্মে মনপ্রাণও আকৃষ্ট হইয়াছে।

পুরাণ সকল সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত। অধিকাংশ বঙ্গবাসীরা সংস্কৃতানভিজ্ঞ। তজ্জন্য কেহ পুরাণ পড়িতে পারিত না। পুরাণে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে কি লেখা আছে, তাহারা সেজন্য জ্ঞাত হইতে পারিত না। তাহারা ভাবিত আর্য্যধর্ম্ম পৌত্তলিকতা ভিন্ন কিছু নহে। তন্নিমিত্ত তাহারা খৃষ্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের আর্য্য-ধর্ম্ম কিছু নহে, এই মিথ্যা ও প্ররোচন বাক্যে মুগ্ধ হইয়া খৃষ্টানও ব্রাহ্ম হইত। যোগেন্দ্রবাবু দেশের সেই স্রোত ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি বক্তা ছিলেন না। বাগ্মীতার প্রতিভায় লোকের চক্ষুতে ধাঁধা দিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি চিন্তাশীল, সুলেখক ভাবুক ও ভাবগ্রাহী

ছিলেন। তাঁহার দ্বারা দেশের অনেক পুরাতন গ্রন্থের উদ্ধার হইয়াছে।

চিন্তাপূর্ণ লেখনী চালনা ভিন্ন সাহিত্যের উন্নতি হয় না। যে দেশে যত চিন্তাশীলতাপূর্ণ ও ভাবময় গ্রন্থ রচিত হইবে,সে দেশের সাহিত্যের তত উন্নতি হইবে। ইংরেজী অতি আধুনিক ভাষা। অল্প সময় মধ্যে ইহার যে কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। ইহার কারণ কি? কিছুই নহে। কেবল চিন্তাশীলতাপূর্ণ ও ভাবময় রচনাবলীর বাহুল্য। যাহার হৃদয় চিন্তাশূন্য ও ভাবস্রোতবিহীন, তিনি লেখক হইতে পারেন না। যে গ্রন্থকারের হৃদয়ে চিন্তার গাঢ়তা সমধিক ও যাহার হৃদয় ভাবপূর্ণ, তিনিই সুলেখক হইতে পারেন। সেই হৃদয় হইতে যাহা বাহির হইবে, তাহা চিন্তাশীলতাপূর্ণ ও ভাবময়। সেইরূপ রচনাই সাহিত্যের অলঙ্কার ও উহার শিরোভূষণ। এইরূপ লেখার দ্বারাই সাহিত্যের উন্নতি হয়। বঙ্গ-ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ অতি বিরল। যতদিন এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন ইহার সাহিত্যের উন্নতির আশা নাই। আমাদিগের দেশে নাটক, উপন্যাস ও নবন্যাসে বঙ্গভাষা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নাটক উপন্যাসে ও নবন্যাসে মনুষ্য-সমাজের চিত্র ও নর-নারীর চিত্র সুঅঙ্কিত হয়। যদি নাটককার, উপন্যাস ও নবন্যাস লেখক যথাযথ মানব-মানবীর চরিত্র-চিত্র অঙ্কনে কৃতকার্য্য না হয়, তবে সে নাটক, সে উপন্যাস বা নবন্যাস লেখা বৃথা, তাহাতে ভাষার বা সমাজের কোন ফলোদয় হয় না। যে মানব-সমাজ উন্নত নহে ও যথাকার মানব-মানবীর চরিত্র সমুন্নত, ধর্ম্মভাবাপন্ন ও উৎকৃষ্ট হয় নাই, সেই সমাজে ভাল নাটককার হইতে পারে না। বঙ্গ-সমাজে লেখকগণ কেবল নাটক, উপন্যাস ও নবন্যাস লিখিতে ব্যগ্র ও ব্যস্ত। মানব-সমাজ ধর্ম্মভাবের ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের আদর্শ-স্থানীয় না হইলে, উপরোক্ত গ্রন্থ কেহ উত্তমরূপে লিখিতে কৃতকার্য্য হয় না। অধুনা বঙ্গ-সমাজ ধর্ম্মবলে ক্রমশঃ হীন হইতেছে, এখানকার অধিবাসীদিগের চরিত্রে নৈতিক-বলের হ্রাস হইতেছে, তজ্জন্য ভাল নাটককার এখানে জন্মগ্রহণ করা অসম্ভব। উপরোক্ত গুণসম্পন্ন না হইয়া লেখকগণ নাটকাদি লিখিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হেতু চেষ্টা করিলে বঙ্গ-সাহিত্যের কোন উন্নতি সাধিত হইবে না। লিখিবার কত বিষয় রহিয়াছে, সে সব ছাড়িয়া কেবল নাটক উপন্যাসাদি লিখিতে ব্যগ্র হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি সুদূর পরাহত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সুলেখক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থসমূহ মধ্যে কয়েকখানি চিন্তাশীলতাপূর্ণ। নাটকাদি লেখা লোকে যত সহজ ভাবে, তাহা তত সহজ নহে। বঙ্কিমবাবুর লেখা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে যে সব চরিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, সে সব বঙ্গ-সমাজের স্ত্রী-চরিত্র হইতে বিভিন্ন। তাঁহার অঙ্কিত একটীও স্ত্রীচরিত্র বঙ্গীয় স্ত্রীচরিত্র গঠনের আদর্শ হইতে পারে না। তাহার কোনটিই অনুকরণীয় নহে। দীনবন্ধুবাবুর নাটক গ্রন্থ সকল এক সময়ে বেশ চটক লাগাইয়া ছিল। তাঁহার লিখিত নীলদর্পণ ভিন্ন কোন নাটকই সমাজে বহুকাল আধিপত্য

করিতে পারে নাই। তজ্জন্য বলি, যদি সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে হয়, সৎভাবপূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টিত হওয়া উচিত।

নাটক ও উপন্যাসে যে সাহিত্যের উন্নতি হয় না, বলি না। তবে তাহা সৎভাবপূর্ণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নূতন ধরণে উপন্যাস লেখার পথ বঙ্কিমবাবু দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার পর আর কয়জন সেরূপ উপন্যাস লিখনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? বোধ হয়, দুই একজন। দেশে ত নাটকের ছড়াছড়ি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কয়খানা নাটক পাঠোপযোগী। নাটক লিখিলেই হয় না, নাটককার হইতে হইলে প্রভূত শক্তি ও বলের আবশ্যক, ভাব ও চিন্তাস্রোতে অবগাহন করিতে হয় এবং কল্পনার রাজ্যের এক সীমা হইতে অন্য সীমা ভ্রমণ করিতে হয়; তবে নাট্যকার হওয়া যায়। পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে কত নাটক রচিত হইয়াছে, কিন্তু অভিজ্ঞান শকুন্তলার এত আদর ও এত গৌরব কেন? পৃথিবীতে এই নাটক সদৃশ কয়খানি নাটক রচিত হইয়াছে? ইংলণ্ডে কত নাটককার ও কত নাটক বর্ত্তমান থাকিতে সেক্ষপেয়ারের নাটকের এত সম্মান ও আদর কেন? তাঁহার ন্যায় কয়জন নাটককারই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের নাটক রাজ্যে সেক্ষপেয়ারের নাটক সকল অতুলনীয়। বলিতে গেলে এক অভিজ্ঞান শকুন্তলা ভিন্ন তাহার সদৃশ নাটক পৃথিবীর সাহিত্য ভাণ্ডারে নাই। ৺গিরীশ ঘোষ মহাশয় অনেকগুলি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন অভিনেতা ছিলেন। রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য তিনি সে সব নাটক লেখেন। অভিনয়ের উপযোগিতা ও উপযুক্ততার প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। সেজন্য তাঁহার দূরদর্শনের প্রয়োজন ছিল না। রঙ্গালয়ে সেই সব নাটক অভিনীত হইয়া দর্শক ও শ্রোতাদিগের যাহাতে মনোরঞ্জন হয়, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, পরে কি হইবে, তাহার ভাবনা ছিল না। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ও সেই সব নাটক গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের কিছু না কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, তবে উপরে যে দুই নাটককারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের লেখার সহিত তাঁহার লেখার তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার নাটক সময়োপযোগী। অল্প সময়ের মধ্যে লোককে মুগ্ধ করিতে পারিবে। যতদিন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবে, ততদিন তদ্দ্বারা লোকে মোহাচ্ছন্ন হইবে। তবে সুদূর ভবিষ্যতে কি হইবে কে জানে। কালস্রোত তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া কোথায় ফেলিবে, বোধ হয়, কেহ তাহার অনুসন্ধানও পাইবে না।

সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাও বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছে। সাহিত্যের উন্নতির জন্য ভাবময়, চিন্তাশীলতা পূর্ণ গ্রন্থের প্রয়োজন। তাহা ব্যতীত সাহিত্যের উন্নতি হইবে না। আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য অল্পদিন মধ্যে উন্নতির পথে যেরূপ ধাবিত হইয়াছে, যদি তাহাতে ধর্ম্মময়,ভাবময়,উন্নত-চরিত্রময় গ্রন্থ সকল বহুলরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ইহার উন্নতি অনিবার্য্য। শ্রীকানাইলাল নাগ।

# অনন্ত মিলন।

বাদসাহের রংমহালে আজ মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। নানা বর্ণের পেশোয়াজ পরিহিতা তাতারাণী বাঁদীগণ আজ ব্যস্ততার সহিত ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে। আজ দিল্লীর নবীন বাদশাহ আকবরের বরণীয় পুত্র সেলিম তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য রংমহালের সমস্ত বেগমদিগকে একটী প্রীতি ভোজ দিবেন, তাই এই উৎসবের আযোজন।

রংমহালস্থ বিরাট উদ্যানে আজ নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীয়মান। নীল, লাল, জরদ, হরিদ্রা, সবুজ নানাবর্ণের কল্পিত লতাপাতায় আজ মঞ্চ সুশোভিত। উদ্যানমধ্যস্থ শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত চত্বরে পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর রেশমী চাদর, তাহার উপর বালিস, তাকিয়া। যুঁই, বেলা, বকুল, চামেলী প্রভৃতি রাশি রাশি পুষ্প সম্ভারে মঞ্চগৃহ সৌরভে আমোদিত। আজ সাহাজাদার বেগমদের মুখে হাসি ধরেনা। তাম্বুলরাগ রঞ্জিত রক্তিম অধরে আজ হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। অলোকসামান্যা, অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সাহাজাদার প্রধানা বেগম রাজ্ঞী নুরজাহান সকলকে আদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণ হইতে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সাহাজাদার আদেশে আজ রংমহালের সমস্ত বেগমদিগকে সেই উৎসবে যোগদান করিতে হইবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সাহাজাদা সেলিম মহার্ঘ পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উৎসব গৃহে আগমন করিলেন। বাঁদীগণ সুমধুর স্বরে বাদসাহের অভ্যর্থনা গীতি গান করিল। নুরজাহান, যোধবাই, ও অন্যান্য প্রধান বেগমগণ বাদসাহকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে মণিমুক্তাখচিত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করাইলেন।

যাহার যেরূপ ক্ষমতা, সুন্দর সুন্দর নানাবিধ দ্রব্য বাদসাহকে উপহার দিতে আরম্ভ করিলেন। সাহাজাদা সেলিম হাস্য মুখে সকলের উপহার গ্রহণ করিয়া বেগমদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। উপহার গ্রহণের পালা শেষ হইলে সাহাজাদা নুরজাহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমস্ত বেগমসাহেবাগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছেন কিনা। বেগম নুরজাহান ভূমিচুম্বন করিয়া বলিলেন—"সাহাজাদা দুনিয়ার মালিক, বাঁদীর গোস্তাকীমাপ হয়। সকলেই আসিয়াছেন কেবলমাত্র ঊষাবাই অসুস্থ হওয়ার দরুণ এ উৎসবে যোগদান করিতে পারে নাই। তবে তাঁহারই এক বাঁদীর মুখে শুনিলাম যে তাঁহার এ অসুস্থতা ভাণ মাত্র। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তিনি এমন কাজ কেন করিলেন, বাঁদী সে সংবাদ জানেনা। সিরাজী পানে উন্মত্ত ক্রুদ্ধ সেলিমের আর সহ্য হইলনা, তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন—"আমার হুকুম অমান্য করে এমন পাপীষ্ঠার রংমহালে স্থান হতে পারেনা। চিরান্ধতম কারাগারই হচ্চে তার উপযুক্ত বাসস্থান।"

মানসিংহের ভগিনী যোধাবাই এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া এই সমস্ত শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি আর স্থির থাকিতে পরিলেননা। তাঁহার আয়ত চক্ষু দুটী অশ্রু তরাক্রান্ত হইয়া আসিল।

বাদসাহকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"স্বামী, প্রভু! একজন সামান্য বাঁদীকে শাস্তি দিয়া আজ এ আনন্দোৎসবে ব্যাঘাত দিবেননা। বাদসাহের করুণা যে সকলের উপর সকল সময়ে অবিচলিত, বাদসাহের কঠিন দণ্ড বিধান যে সামান্য কারণে তাঁহার আশ্রিত জনের উপর পরিচালিত হয় না, সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিবেন না। তুচ্ছ বাঁদীর বাঁদী সে, না বুঝে সাহাজাদার আদেশ পালন করে নাই বলে তার প্রতি নিষ্ঠুর হবেন না।"

দাম্ভিক সেলিম যোধবাইএর কথায় কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ উষাবাইকে লইয়া আসিবার জন্য নুরজাহানকে ইঙ্গিত করিলেন। আজ্ঞামাত্র ৪ জন বাঁদী রংমহালের দিকে অগ্রসর হইল। উৎসবের প্রারম্ভেই এইরূপ অসম্ভাবিত দুর্ঘটনা দেখিয়া অন্যান্য বেগমগণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

উষাবাইএর বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বাদসাহের হুকুমে তিনি আজ চিরন্ধকারময় কারা-গৃহে বন্দিনী।

গভীর রাত্রি। সুষুপ্তির তীব্র মদিরা পানে জগৎ নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে প্রহরিগণের উচ্চ চীৎকার ব্যতীত এবং শ্যামপ্রিয়া যমুনার কালজলের ছল ছল শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। কেবলমাত্র দুঃখিনী উষাদেবী আজ নির্নিদ্র নেত্রে দারুণ মনকষ্টে সেই কারাগৃহে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন—"প্রাণেশ্বর! সকলেই তোমার সাদর নিমন্ত্রণে, উৎসবে যোগদান করেছিল, কিন্তু আমার কেন সে সৌভাগ্য হ'লনা। কেন তুমি আমার কুটীরে একবারের জন্য পদধুলি দিলেনা। বাঁদী এমন কি দোষ করেছে যে, তার গৃহে পর্য্যন্ত আসিতে তোমার মন সরেনা! কই আগে ত এমন ছিলেনা। বিবাহের পর পতিগৃহে আসিয়াই আমি ত তোমার অসীম প্রেমের অধিকারিণী হয়েছিলাম। আগে কত ভালবাসিতে, কত আদর করিতে, তবে কেন এমন হলে! আমি যে অনেক আশা বুকে করে তোমার আশাপথ চেয়ে বসেছিলাম নাথ! শুষ্ক নির্জ্জিব প্রাণ খানি তোমারই আগমন কল্পনায় আবার যে আনন্দে নেচে উঠেছিল! নাথ! তোমাকে নির্জ্জনে দেখবার সাধ করে আমি তোমারই আশা পথ চেয়ে বসেছিলাম কিন্তু তুমি ত এলেনা! পাপিষ্ঠা আমি তাই তুচ্ছ অভিমানের নেশায় তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি। তাই আজ আমার এ শাস্তি। কিন্তু এই ভীষণ শাস্তি, যার কল্পনামাত্রে বীরের হৃদয়ও কেঁপে ওঠে, এই যন্ত্রণা আমি অবাধে সহ্য করতাম যদি প্রতিদানে একবার তোমার দেখা মিলিত। কিন্তু অভাগিনীর অদৃষ্টে সে সুখ যে নাই, তা' জেনে শুনেও তোমায় দেখবার জন্য প্রাণ এমন আকুল হয়ে ওঠে কেন? এমন করে কেঁদে ওঠে কেন? এমন বুকফাটা দুঃখে প্রাণের পুঞ্জীকৃত হাহাকার শূন্যে মিশিয়ে যায় কেন? আমার যে বড় সাধ তোমার কাছে কাছে থাকি, তোমার চরণের ধূলিকণায় মিশিয়ে যাই, তোমার সুন্দর মুখখানি দিবারাত্রি দেখবার জন্য আমার ক্ষীণদৃষ্টিশক্তিকে সেইরূপ করিয়া তুলি। কিন্তু তা'ত পারি না দেব! তুচ্ছ অভিমান এসে মাঝে মাঝে যে আমায়

তোমার কাছ থেকে অনেক—অনেকদূরে লয়ে যায়। স্বামী! হিন্দুরমণী আমি, আমি আর কোনও দেবতা জানি না, আর কাহারও অনুগ্রহ ভিখারিণী নই, আমি শুধু তোমাকে চাই, তোমার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেতে চাই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার সে ক্ষমতা লাভ হয়, যেন এ সাধনায় আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারি।" ঊষাবাই সেই অন্ধকার কারাগৃহে বসিয়া এইরূপে কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাহার সে দুঃখ-কাতরতায় কর্ণপাত করিল না।

কত দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, মনের দুঃখে, অবসাদের আবিলতায় ভগ্ন-হৃদয়ে কাটিয়া গেল। মনে যেটুকু আশা ছিল, হয় ত সাহাজাদা তাহাকে কারামুক্ত করিয়া আবার হৃদয়ে ধারণ করিবেন, কিন্তু দিনের পর দিন গেল—তাঁহার সে ক্ষীণ আশাটুকু পূর্ণ হইল না। অদৃষ্ট! তুমি যাহাকে কষ্ট দিবার ইচ্ছা কর, সে রাজরাণী হইলেও তাহার যন্ত্রণার সীমা থাকে না।

একদিন—যখন ঊষাবাই বুকফাটা দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। জনমানবের সাড়া নাই। বিরাট অন্ধকারে সেই ভয়ানক কারাগৃহ যেন আরও ভয়ানক দেখাইতেছিল। মৃত্যুর সিংহ-দ্বারে বিকটাকার অপঘাত দৈত্যের মত সেই অন্ধতম কারাগার মনে এক প্রবল ভীতি সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঊষাবাই ক্রমে হতচেতনা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার তখন আর ভাবিবার বা কাঁদিবার শক্তি ছিল না। সেইরূপ মুহ্যমান অবস্থায় তিনি যেন শুনিলেন, তাঁহাকে কে আহ্বান করিতেছে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঊষাবাই সেই আহ্বানের মধুর স্বরে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইলেন। দেখিলেন—রক্তবস্ত্রপরিহিত গৌরবর্ণ সুন্দর দেবোপম এক পুরুষ-মূর্ত্তি তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিকটে আসিতে বলিতেছে। মূর্ত্তির মস্তক বেড়িয়া এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সেই অন্ধকার গৃহকে স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া দিয়াছে। মুগ্ধা ঊষাবাই ধীরে ধীরে সেই পুরুষ-মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইলেন। মূর্ত্তি বলিল—"বৎসে, আমায় চিন্‌তে পার কি?" ঊষাদেবী বলিলেন—"প্রভু, পিতা, আপনি যেই হউন, আমায় এ দারুণ যাতনার হাত হ'তে মুক্ত করুন। আমি এ বিচ্ছেদ যাতনার তীব্র শেলাঘাত আর সহ্য করতে পারি না, আমায় দয়া করুন।" এই বলিয়া ঊষাদেবী তাহার পদতলে পতিত হইলেন। পিতা যেমন স্নেহের কন্যাকে আদরে নিজের কোলে তুলিয়া লন, মূর্ত্তি সেইরূপ ঊষাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"বৎসে! এ সংসার কেবল শয়তানীতে ভরা। এখানে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া দুষ্কর। সতি! আমি ধর্ম্ম-রাজ। ঈশ্বর আমাকে পাপ পুণ্যের বিচার কর্ত্তা করিয়া ধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছেন। সেইজন্য আজ তোমার আহ্বানে তোমাকে আমি আমার শান্তিময় আলিঙ্গন দিতে এসেছি। মা আমার। তোমার এ স্বর্গীয় প্রেমের সাধনার ফল এসংসারে কখন পাবে না। বিধির সে ইচ্ছা নয় মা! তাই তোমাকে আমি আজ এই সংসারীলোকের স্থূল দেহের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম দেহ দিতে এসেছি। তোমার ইষ্ট-

দেবতার সহিত এক হ'য়ে যা'বার ইহা ব্যতীত আর উপায় নাই। তোমাকে এমন ক্ষমতা দান করব, যদ্বারা তুমি তোমার বাঞ্ছিতের হৃদয়ের মাঝে বিরাজ করে, তাহার প্রাণে প্রাণ মিশাতে সক্ষম হবে। তোমাতে ও সাহাজাদা সেলিম, তোমার আরাধ্য পতিদেবতা যিনি, তাঁহাতে আর কোনও প্রকার স্বাতন্ত্র্য ভাব থাক্‌বে না।" গত জন্মের কর্ম্মফলে আজ তুমি এইরূপে লাঞ্ছিতা এবং অবমানিতা। কিন্তু মা, তোমার এজন্মের প্রাণপাত সাধনায় এবং অসীম একাগ্রতায় তুমি যা কামনা করেছ, তাই পূর্ণ হবে। এস মা, আমার সঙ্গে এস।"

প্রভাতকাল। ঝন্ ঝন্ শব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া কারাগারের লৌহদ্বার খুলিয়া গেল। বিস্মিত কারাধ্যক্ষ দেখিল যে ঊষা-দেবীর মৃতদেহ সেই কঠিন কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত গৃহতলে পড়িয়া আছে। কে যেন রাশি রাশি শ্বেতপুষ্পে ভগবান পিণাকীর পূজা করিয়াছে।

সাহাজাদা সেলিম এ সংবাদ পাইবামাত্র কি জানি কেন হঠাৎ প্রাণের মাঝে এক দারুণ অভাব অনুভব করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই কারাগৃহে আসিয়া দীনহীন কাঙ্গালের মত ঊষাদেবীর মৃতদেহের উপর পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সেইদিন হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ভারতেশ্বর জাহাঙ্গীর বাদসা ভিখারীর সাজে সাজিয়া ঊষাদেবীর কবরের উপর নামাজ পড়িতেন এবং সুন্দর সুন্দর গন্ধপুষ্পে সেই পবিত্র স্থানটী অতি যত্নে সজ্জিত করিতেন।

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

## "ভুলি নাই"।

কত দিন গেছে চলি,
মনে করি ভুলি ভুলি,
তবু কেন পোড়া মন
ভুলিল না হায়!
মনাগুনে দগ্ধ হ'লে
আঁখি-জলে ধোয়াইলে,
হৃদয়ের দাগ বুঝি
মোছা নাহি যায়॥
কত যত্ন করিলাম,
কিন্তু কই পারিলাম;
পুনঃ যেন আঁকিলাম
হৃদয়ে তাহায়।
ভোলা কি মুখের কথা,
ভুলিতে কি, নাহি ব্যথা;
মনে প্রাণে হ'লে গাঁথা
ভোলা কিগো যায়॥
সত্য তুমি আছ দূরে,
স্বপনের অগোচরে;
অন্তরের কি অন্তরে!
বোঝা নাহি যায়।
নয়ন মুদিয়া থাকি,
তুমি ময় সব দেখি;
রবো সদা মাখামাখি,
তোমায় আমায়॥
অতীত সে যত খেলা,
জানি হেন দেব-লীলা;
স্মৃতি-পথে গাঁথি মালা
হৃদয়ে জাগায়।

তাই প্রিয়! ভুলি নাই,
ভুলিতে কি পারি তাই?
সদা সাধ মিশে যাই
হৃদয়ে হৃদয়॥

শ্রীগঙ্গাধর।

---

# সন্ধ্যা এবং গায়ত্রী।

( ১ )

যাহা গান করিলে পরিত্রাণ হয়—তাহা গায়ত্রী। [গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ] ত্রাণ কি হইতে? বন্ধন হইতে; মায়া মোহ হইতে; পরিচ্ছন্ন এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় ভ্রম এবং নিরানন্দ হইতে।

জীব মনে করে যে সে বুঝি দেহ। এই স্থূল দেহাভিমান হইতে (ভক্তির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া) মুক্ত হইলেই সে মনে করে সে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ। তাহা হইতে আরও শুদ্ধ চিত্ত হইয়া এবং বিচার দ্বারা মুক্তি পাইলে, "সে" ভ্রমটা কাটিলে, সে মনে করে যে সে জীবাত্মা; পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ। তাহা হইতেও বিচার এবং যোগ দ্বারা মুক্তি পাইলে—সর্ব্বোচ্চ অধিকারী হইলে জীব বুঝিতে পারেন—প্রত্যক্ষই অনুভব করেন—যে তিনি দেহাতীত নিত্য বস্তু—সর্ব্ব বিশ্বান্তরাত্মন্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই তিনি। তদতিরিক্ত যে কিছুই নাই! তখন কিছুই নাই! তখন সকল মায়া মোহ ভ্রম কাটিয়া গিয়াছে। যখন জীবাত্মা ভাবে একটু পৃথক সত্বারও কামনা বা আশা রাখা হয় না—যখন মনের পূর্ণ নিবৃত্তি দ্বারা পরম উপশান্তি হয়—তখনই এই জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। উহাই প্রকৃত ও পূর্ণ মুক্তি। দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে যে মনের নিবৃত্তি হইয়া থাকে—তাহা সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত মুক্তি নহে। সজ্ঞানে নিষ্কামে নিত্য বস্তুর উপলব্ধি সহ মৃত্যুতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেহ মুক্তি হইতে পারে। কামনা থাকিতে কারণ শরীর বা লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর যাহাই উহাকে বল, তাহার নাশ হয় না। সাধারণ মৃত্যু বন্ধন হইতে মুক্ত করে না। বিশেষ জীবন এবং বিশেষ মৃত্যুই জীবন্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি দিয়া থাকে। "জীবন্মুক্ত সতেজস্বী সন্ধ্যা পূতো হি যদ্দ্বিজঃ।" সন্ধ্যাপূত তেজস্বী ব্রাহ্মণ জীবন্মুক্ত। তাঁহার ভয়, শোক, আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। "অহং দেবো ন চান্যস্মি ব্রহ্মৈ বাহং ন শোক-ভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্য মুক্ত স্বভাব-বান্॥"—ইহাই তাহার পক্ষে মুখের কথা নহে। ইহা তাহার অনুক্ষণের প্রত্যক্ষ অনুভূত অবস্থা। তিনি "সোহং"—আমিই সেই—ইহা উপলব্ধি করিতেছেন। ব্যবহারিক জীবন নিরুদ্বেগে সহজ ভাবেই যাপন করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই বিক্রিয়া নাই। কোন কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই। কিছুরই আশা রাখেন না। আপ্তকাঙ্ক্ষ্য বা স্পৃহা পূর্ণতা প্রাপ্তের আকাঙ্ক্ষা কোথায়? রোগের ও শোকের উদ্বেগেও তাঁহার সদানন্দ ভাব! শারীরিক কষ্ট যেন বুঝিতেই পারেন না! "ধীরে ধীরে 'কিছু' হইয়া যাইবে!"—সে জন্য তাহার চিন্তিত বা ব্যগ্র হওয়ার প্রয়োজন নাই! নিজেরও সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার আনন্দময় ভাব! নিয়মান্-

গামী ব্রাহ্মণ—জীবনের এই অপূর্ব্ব শিক্ষার এই ফল কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া থাকিবেন।

সন্ধ্যার মুখ্য অংশ গায়ত্রী। এক্ষণে দেখা যাউক সন্ধ্যা ও গায়ত্রীতে কি আছে। উহা এমন কি শিক্ষা দেয়, এমন কি অনুশীলন করায় যাহা হইতে জীবন্মুক্তির সম্ভাবনা হয়? প্রথম শিক্ষা দেখ সন্ধ্যার সময় কখন? যখন আলোক এবং অন্ধকারের সন্ধিস্থল, যখন সূর্য্য-শক্তির এবং সোম-শক্তির সন্ধিস্থল সেই সময়টাই প্রাতঃ এবং সায়ং সন্ধ্যার সময়। দুই শক্তির সন্ধিস্থলে স্থিরভাব। তাহার পর কোন একটা কমিবে, কোন একটা বাড়িবে। একটা ঢিল উচ্চে ছুঁড়িয়া দাও। উহার ক্ষেপনের বল ক্রমশঃ মাধ্যাকর্ষণের বলে হ্রাস হইতে হইতে এমন এক মুহূর্ত্ত মাত্র সময় আসিবে, যখন ঐ ঢিল উচ্চে স্থির আছে—উঠিতেছেও না, নামিতেছেও না। তাহার পরই নামিতে আরম্ভ করিবে। ঐ স্থির ভাবের সময়টী সন্ধিস্থল। বাহ্য জগতে যখন সন্ধ্যা বা দুই শক্তির মধ্যে কতক বিষয়ে স্থিরভাব, অন্তর্জগতেও তখন স্থিরভাব আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। সেইজন্য ঐ সময়েই যোগের দ্বারা সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য ঋষিদিগের সন্ধ্যা-বন্দনার ব্যবস্থা। সন্ধ্যার কার্য্য কি, কি? (১) পরমাত্মার করুণা বারিতে স্নান করিয়া মলাপকর্ষণ; প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত স্থির করণ; অপরাধ-ত্রুটী সকল স্মরণ করিয়া সে সকলের হোম করিয়া ফেলা অর্থাৎ ত্যাগ করার জন্য তীব্র মানসিক চেষ্টার প্রয়োগ; তর্পণ বা বিশ্বের সমগ্র ভাগেরই তৃপ্তির জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ বা বিরাট বিশ্ব-প্রেমের অনুশীলন, সূর্য্যোপস্থাপন, আচমন প্রভৃতির দ্বারা মনকে উচ্চে লইয়া গিয়া পরিশুদ্ধ করণ; গায়ত্রী জপ দ্বারা বিশ্বপ্রসবিতার পূজনীয় তেজের (আদ্যা মহাশক্তির ধ্যান; উহারই প্রশান্তভাবে ধ্যানের দ্বারা সেই শক্তির আধার অবাঙমনসোগোচরের আভায় সৎচিদানন্দে নিমগ্ন হওয়া; যাহার ধ্যান করিবে তাহারই সহিত তদাত্মতা পাইবে। এই অনন্তশক্তির ধ্যানে জীবের শক্তি যে বৃদ্ধি হইবে তাহা বলার অপেক্ষা করে না। গায়ত্রী জপে আমিত্বের প্রসার হইবে। ভূতল অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গে মন ব্যাপ্ত হইবে—এবং সেই অনন্তের, সেই বিশ্বাত্মার বরণীয় ভর্গের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইবে।

তবেই হইল যে চিত্তশুদ্ধি করিয়া মন স্থির রাখিয়া (সন্ধ্যায়) পরমাত্মার—সৎচিদানন্দের—পূজনীয় তেজের ধ্যানই সন্ধ্যা—গায়ত্রী। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। সদা সর্ব্বক্ষণই সন্ধ্যার উপাসনা করিবে—অর্থাৎ সর্ব্বদাই মন স্থির রাখিবে, সাম্যাবস্থা প্রাপ্তিই ইহার উদ্দেশ্য। উহাই শক্তির পূর্ণতা সংরক্ষণ করে এবং ব্রহ্মতেজের পূর্ণ বিকাশের আনন্দ এবং শান্তি দান সকল অবস্থায় করে।

"তত্র কঃ শোক কঃ মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ।"

একত্বদর্শী জীবসমূহের শোক মোহ কোথায়? এইজন্য ব্রাহ্মণগণ শোক-মোহে অভিভূত হইতেন না। হায়! আজকাল ব্রাহ্মণ আমরা এই সন্ধ্যা গায়ত্রীর উপাসনা ছাড়িয়া দিয়া কি দুর্গতিই ভোগ করিতেছি। এডুকেশন গেজেট।

# ভুঁইহার।

ভূমি ও কর অর্থাৎ যাহারা কৃষিকার্যোপযোগী ভূমি প্রস্তুত করে বা কৃষিকার্য্য করে। ভুঁইহারগণের মধ্যে অনেকেই ভূস্বামী এবং অপর সকলে কৃষিকার্য্য-নিপুণ। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ পূর্ব্বাংশের জেলা সমূহে ইঁহারা বাস করেন। ইঁহারা বাভন, জমিন্দার, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ ও পছিয়া-ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত।

## উৎপত্তি সম্বন্ধে মতামত।

পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া তাহাদিগের স্থানে ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করিলেন; কালক্রমে এই সকল ব্রাহ্মণ আপনাদিগের ধর্ম্মচর্চ্চা ভুলিয়া কৃষিকার্য্যে তৎপর হইয়া উঠিলেন। ইহারাই বর্ত্তমান কালের ভুঁইহার।

অন্য মতে—অযোধ্যার কোন রাজা অপুত্রক ছিলেন, তিনি পুত্রলাভার্থ কুলগুরু ও পুরোহিতের পরামর্শানুসারে এক ব্রাহ্মণ কুমারকে ক্রয় পূর্ব্বক নরমেধ যজ্ঞ করিতে কৃত-সংকল্প হন এবং তদনুসারে ঋষি জমাগ্নির পুত্রকে ক্রয় করেন। অবশেষে নরবলির কোন প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু বিক্রিত কুমার পতিত বিবেচিত হয় এবং বাধ্য হইয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করে। এই বালক ভুঁইহারগণের আদিপুরুষ।

মতান্তরে—মগধরাজ জরাসন্ধ কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে সওয়া লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার প্রয়োজন হয়। করণশাখার একজন কায়স্থ জরাসন্ধ নৃপতির দেওয়ান ছিলেন, তিনি সাধ্যানুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিতে যত্ন করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করেন। পরে সকলকে লইয়া ভূপতি-সমীপে গমন করেন এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলের পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু নৃপতি যজ্ঞোপবীতধারী দ্বিজেতর জাতিদিগের আকৃতি দর্শনেই তাহাদিগকে ব্রাহ্মণেতর জাতি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

এদিকে দেওয়ান রাজার সন্দেহ দূরীকরণার্থ ঐ সকল ব্রাহ্মণ-বেশধারী কর্ত্তৃক পক্কঅন্ন ভোজন করিয়া রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন। তদবধি ঐসকল ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণগণ স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত এবং 'বাভন' বা 'বাহমন' নামে অভিহিত হইলেন। (১)

আজিমগড়ের ব্রাহ্মণ ও ছত্রী প্রতিবাসীগণের ইঙ্গিতানুসারে ভুঁইহার মিশ্রজাতি; ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে ভুঁইহার জাতির উৎপত্তি। অপর জাতিগণ ভুঁইহারদিগকে এক প্রকার ছত্রী (ক্ষত্রিয়) বলিয়া উল্লেখ করে; তাহাদিগের ভাষায় ভুঁইহারদিগকে 'ভুঁইহার-ঠাকুর' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। ভুঁইহারদিগের গোত্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায়। যজ্ঞোপবীতের সূত্র ৯৬ হস্ত দীর্ঘ, ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ ৮০ হস্ত। ভুঁইহারগণ ব্রাহ্মণোচিত পৌরহিত্য করেন না কিম্বা দান ও দক্ষিণা প্রাপ্ত হন না। অপর জাতিগণ ইহাদিগকে প্রণাম বা "পায়লাগি" বলিয়া অভিবাদন করে এবং ইহারাও আশীর্ব্বাদ শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের শারীরিক গঠন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের সমতুল্য। আকৃতি

(১) Tribes and Castes, I, 24.

ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগের সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যান্বিত। (২)

ভূঁইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে :—

"নদী কৈ ভানোযক,
ভূঁইহার কৈ ঘানোযক।
সব্‌সে চতুর বেনিযা, তেসে চতুর সোণার,
সসে সুসে লাইকে তেহি ঠগে ভূঁইহার।"

নদীর স্রোতের ন্যায় ভূঁইহার অনিশ্চিত। বেনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা চতুর, তদপেক্ষা চতুর সোণার ; কিন্তু ভূঁইহারের ছলনাদ্বারায় উভয়ই প্রতারিত হয়।

ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিযগণ ভূঁইহারদিগের সহিত ভোজন করেন না। যাহা হউক ভূঁইহারগণ যে, আর্য্য-জাতি তদ্বিষযে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালের প্রথানুসারে কৃষিকার্য্য করিযা পতিত হইয়া থাকিবেন।

গাজীপুরের ভূঁইহারগণের শৌচাচারাদি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বিশুদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের শ্রেণী-বিভাগ বা গোত্র রাজপুতগণের ন্যায়। যথা :—

কিনোযার, গৌতম ও কৌশিক ভূঁইহার। প্রাগুক্ত শ্রেণীর রাজপুতগণ সময়ে সমযে আপনাদিগের আদি বাসস্থানের যে যে নাম উল্লেখ করেন সেই সেই স্থান ভূঁইহারগণও আপনাদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া স্বীকার করেন এবং একই ব্যক্তি উভয় জাতির আদিপুরুষ বলিয়া কথিত হন।(১) ভূঁইহারগণ সম-শ্রেণীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করেন। পক্ষান্তরে রাজপুতগণ আপনাদিগের অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর সহিত কন্যার বিবাহ প্রদান করেন এবং পুত্রের বিবাহ আপনাদিগের অপেক্ষা নিম্নতরশ্রেণীর রাজপুত তনযার সহিত প্রদান করিতে কোন প্রকার আপত্তি করেন না কিন্তু পরস্পরে পান ও ভোজন করিতে সম্মত হন না। (১)

ভূঁইহারগণ ব্রাহ্মণ ; কোন কারণে কৃষিকার্য্যদ্বারা পতিত হইযা থাকিবেন। যাহা-ব্রাহ্মণ, ওঝা বা দকৌৎগণ পতিত ব্রাহ্মণ বটে কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে অনেকের আকৃতি দর্শন করিলে বোধ হয় না যে,ইহাদিগের ধমনী মধ্যে বিন্দুমাত্রও আর্য্য-শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের অনেক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ও অনেকে কৃষিকার্য্যদ্বারা দিনপাত করিযা থাকেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা পতিত নহেন। ব্রাহ্মণ বলিযা উক্ত ও সম্মানিত হন। [২]

ভূঁইহারগণের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও আকৃতিগত সাদৃশ্য ব্রাহ্মণগণের তুল্য, কিন্তু ইহাদিগের জাতীয় পর্য্যাযের বন্ধন ব্রাহ্মণগণের ন্যায নহে। যাহা হউক বোধ হয় যে, ইঁহারা একদা ব্রাহ্মণ বলিয়া আর্য্য-সমাজে সম্মানিত হইতেন, এক্ষণে আপনাদিগের কোন কার্য্য-দোষে অধঃপতিত হইয়াছেন। নিঃসন্দেহ ইহারা আর্য্য-জাতির এক শাখা।

## জাতীয়-পর্য্যায়।

ইহাদিগের পর্য্যায় দুইপ্রকার, প্রথম পর্য্যায়

(১) Azamgarh Settlement Repot, 27, sg.

(১) Dr, Oldham, Ghazipur memo, 1, 43.

(2) Tribes and Castes of N. W. P. and Oudh vol, 11, 67.

আবাসস্থানের নামানুসারে ও দ্বিতীয় পর্য্যায় গোত্রানুযায়ী।

বাসস্থানের নামানুসারে ঃ—

কিনোয়ার, দোনোয়ার, সকরোয়ার, বাঘোছিয়া, বেমুওয়ার, করেনওয়া বা করেনবা, কোটরাহা, করমাই, কোলহানিয়ান, অথরিযা, জৈথরিয়া, চন্ধারী, কোটাহা, সোত্রনিযান, বেলহারিয়া, ডোমকাতাব, বকুসারিয়া, একসরিয়া, গৌতামিয়া, টিটিহা, ভৈত্তযাধ, কোলহা, সোরহানিয়া, বিরুযার, সুরোহান, বীবরামিযা, কহতোয়ার, মির্জ্জাপুরী, বৈকোয়ার ও পরসিয়া।

এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণের উপাধীও আছে যথা, দিক্ষিত, গর্গ, গৌতম, সাণ্ডিলা, পাঁড়ে, দুবে, তেওয়ারী, উপাধ্যায়, পাঠক, সুকুল, কপীলগোত্রী, কৌশিক, ভরদ্বাজ ও পয়াসী মিশির। অপর ইহাদিগের ৮৪ গোত্র ব্রাহ্মণদিগের সদৃশ, যথা ;—

কাশ্যপ, বশিষ্ট, পরাশর, ভার্গব, বাৎস্য, কাত্যায়ন, গর্গ, গোভিল, আঙ্গিরস ইত্যাদি।

লোক গণনা তালিকায় ভুঁইহারগণের অন্যূন ৪৫৮ সংখ্যক বিভাগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল সংখ্যায় স্থানীয় নাম ও ব্রাহ্মণ্যগোত্র সম্মিলিত। কোন্ জেলায় কোন্ কোন্ বিভাগীয় ভুঁইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

| বিভাগ বা শাখা। | জেলা। |
| --- | --- |
| চৌধুরী, গৌতম ও কোলহ | বেণারস। |
| গৌতম | মির্জাপুর। |
| ভরদ্বাজ, ভৃগুবংশী, দিক্ষিত, দোনোয়ার, গৌতম, কৌশিক, কিনোয়ার, কিস্তোযার, সকরোয়ার ও সোনোয়ার। | গাজীপুর। |
| অসুবিযা, ভগৎ, ডোমকতার, কিনোয়ার, মনচোরা, নৌলিয়া ও বেমোযার। | বালিয়া। |
| বরসি. বিবহাবিয়া ও কৌশিক। | বস্তি। |
| বডোয়ার, ভরদ্বাজ, ভৃগুবংশ, দোনোয়াব, গর্গবংশ, গৌতম, পুরোযার, সকবোয়ার ও সাণ্ডিল্য। | আজিমগড়। |

সাংসারিক উৎসব, পার্ব্বণ ও সংস্কারাদি সাধারণ হিন্দু নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়।

ধর্ম্ম।—ইঁহারা শৈব বা শাক্ত। কিন্তু গ্রাম্য দেবতা ও স্থানীয় ভূত বা দেত্যাদির উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন গেরিয়া, হরদিয়া, বন্দীমাই ইত্যাদি।

কিনোয়ার।— কোনোয়ার ভুঁইহ।রগণ কিনোযার রাজপুতগণের ন্যায় কর্ণাটিকের পদমপুর নগর আপনাদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। গাজীপুরের কিনোয়ার ভুঁইহারগণ রাজধর, মুকুন্দ ও পিথোর রায় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

বেমোয়ার।—বেমোয়ার ভুঁইহারগণ কহেন যে, তাঁহারা বেনপুর হইতে আগমন পূর্ব্বক বেণারসের নরোয়াণে বসতি করেন। ইঁহারা সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী।

সকরোয়ার।—সকরোয়ার রাজপুতগণের ন্যায় সকরোয়ার ভুঁইহার শাখা [illegible] সিক্রী হইতে সকরোয়ার [illegible]। গাজীপুরে ইহারা ধনী বলিয়া [illegible]। [illegible] পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

দোনোয়ার।—ইহাঁরা ফতেপুর সিকরীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের আদি অধিবাসী। ইহাঁরা যখন আজিমগড়ে বসতি করেন, তদবধি ভাট নামে অভিহিত হন। দোনৌনী গ্রামের নাম হইতে দোনোয়ার নামের উৎপত্তি। দোনৌনী নাম পুনরায় দোনা আচার্য্য নামক একজন পাঁড়ে ব্রাহ্মণের নাম হইতে উৎপন্ন। ডাক্তার ওল্ডহাম ( Dr. Oldham ) বলেন যে, দোনোয়ারগণ গ্রাসাচ্ছাদনে বাহ্যাড়ম্বর শূন্য ও পরিশ্রমী। ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে ২।৩ খানি গ্রামের নিষ্কর উপসত্ব ও খাঁ উপাধী প্রাপ্ত হন। আজি পর্য্যন্ত তদীয় সন্ততিগণ খাঁ উপাধীধারী।

গৌতম।—হিজরি ৩০৪ অব্দে (৮৮২ খৃষ্টাব্দ) খস্তু মিশ্র নামক গৌতম গোত্রের একজন ব্রাহ্মণ কাশীতে আগমন করেন। প্রত্যহ স্নানান্তে তিনি কিঞ্চিৎ জল মাদার বৃক্ষের* মূলদেশে প্রদান করিতেন। মাদার বৃক্ষে এক রাক্ষস বাস করিত এবং অদৃশ্যভাবে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত বারি পান করিত। একদিবস ব্রাহ্মণ বৃক্ষমূলে বারি সিঞ্চন করিতে বিস্মৃত হন, সেই হেতু রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাহার পিপাসা নিবৃত্তি করিতে কহিল। ব্রাহ্মণ তাহার প্রার্থনা পূরণ করিলে রাক্ষস পরিতৃপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে তাহার নিকট হইতে ইচ্ছামত কোন দ্রব্য প্রার্থনা করিতে কহিল। খস্তু কহিলেন যে, তাঁহার পরিধেয় আর্দ্র বসন শূন্যে উহার রক্ষা করিয়া শুষ্ক করিতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়; ইহার কোন সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সে সক্ষম কিনা? রাক্ষস কহিল—"আমি তোমাকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতেছি যে, তদ্দ্বারা তোমার আর্দ্র বসন শূন্যে নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শুষ্ক না হইবে—আর্দ্র রহিবে, ততক্ষণ অবধি শূন্যোপরে রহিবে কিন্তু শুষ্ক হইলেই তোমার হস্তে আসিয়া পতিত হইবে। রাক্ষসের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ ব্যাসের সহিত পরিচিত হইলেন, তৎকালে ব্যাস কাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অচিরে ব্রাহ্মণের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে কাশীবাসীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ক্রমশঃ খস্তুর খ্যাতি অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হইল এবং খস্তু ক্রমান্বয়ে একজন ধনশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তিনি কাশীতে একটি পুষ্করণী খনন করাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ রোপণ করিলেন। পুষ্করণীর নাম 'মিশিরকা পোখরা' হইল। অধুনা মিশির পোখরা কাশীর মোহল্লার নাম। খস্তু মিশ্রের সময় রাজরণার কাশীশ্বর ছিলেন। একদা রাজহস্তী মিশির রোপিত একটি বৃক্ষ নষ্ট করে, তাহাতে মিশির অতিশয় রাগান্বিত হন; রাজা অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা করেন। একদা রাজা একটী তাম্বুল প্রদান করেন। ঐ তাম্বুল মধ্যে ২৮ খানি গ্রামের দানপত্র ছিল। ব্রাহ্মণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাম্বুল ভক্ষণ করিলেন। মনে করিলেন যে, তাম্বুল গ্রহণে কোন দোষ নাই, তিনি তো আর রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেছেন না? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, তাম্বুল চর্ব্বণ করাতে ২৮ খানি গ্রামের দান গ্রহণ করা হইল। এই দান গ্রহণের পর

* Asclepias gigantea.

হইতেই শূন্যোপরে আর্দ্রবস্ত্র শুষ্ক করিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। প্রাগুক্ত ২৮ খানি গ্রাম লইয়া আজিকালি গঙ্গাপুর জমিদারী মিশিরের সন্ততিগণের অধিকৃত। বর্ত্তমান কাশীরাজ উক্ত মিশির বংশোদ্ভব। ইঁহার উপাধী মিশির বা মিশ্র; গৌতম গোত্রের বিপ্রশাখাভুক্ত এবং সামবেদের কৌতুমিয়া শাখা। তিন প্রবর, যথা—গৌতম, আঙ্গিরস ও অস্থাতিয়া। মধ্যান্দিন শাখার ভূঁইহারগণের সহিত বিবাহের আদান প্রদান হইয়া থাকে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইহাঁদিগের ব্যক্তিগত বিশুদ্ধতা আছে এবং ইহাঁরা ব্রাহ্মণগণ পালনীয় নিয়ম সকল পালন করিয়া থাকেন। যদিও ইহাঁরা স্বহস্তে হল চালনা করেন না বটে কিন্তু ইহাঁদিগের তত্ত্বাবধানের গুণে ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়। ইহাঁরা কৃষিকার্য্যে সুদক্ষ বলিয়া যেরূপ ইহাঁদিগের সুখ্যাতি তদ্রূপ বিবাদকারী ও অভিযোগপ্রিয় বলিয়াও অখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। কৃষিকার্য্য ব্যতীত অনেকে আড়ৎদারী ও তেজারতি করিয়া থাকেন। লোক গণনার তালিকানুযায়ী ভূঁইহারগণের সংখ্যা নিম্নে লিখিত হইল* :—

| | |
|---|---|
| আজিমগড় | ৬১,৪২৫। |
| গাজীপুর | ৫৪,৬০৬। |
| গোরক্ষপুর | ৩১,২০২। |
| বালিয়া | ২৫,৭৭৭। |
| বারাণসী | ২১,২৭২। |
| বস্তি | ১২,৭৪৪। |
| মির্জ্জাপুর | ৯,৮৮৫। |
| জৌনপুর | ৪,২৯২। |
| ফয়জাবাদ | ১২৪। |
| প্রতাপগড় | ১১২। |
| লক্ষ্ণৌ | ৮৬। |
| গোন্দা | ১। |
| বুলন্দ সহর | ১। |
| সমষ্টি | ২,২১,০২৭। |

শ্রীআশুতোষ তরফদার।

* Hindu Tribes, I; 41, sq.

# রাজা নীলাম্বর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### যুদ্ধ।

রজনী প্রভাত হইল অগণিত মুসলমান সৈন্য দক্ষিণ দ্বার আক্রমণ করিল। „ গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ুম্ ” কামানের ঘন ঘন শব্দ হইতে লাগিল, ভিতর হইতেও তাহার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। বৃদ্ধ সেনাপতিও হংসেশ্বর রায় যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন, রাজা নীলাম্বর স্বয়ং ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। গৌড়েশ্বর বাহিরে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধের ফলাফল দেখিতেছিলেন তিনি এখনও নির্লিপ্ত, তাঁহার মনে বিশ্বাস এই সামান্য যুদ্ধে তাঁহার অবতারনা আবশ্যক হইবে না। মুসলমান সেনাপতি অমিত বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিলেন জয় পরাজয়ের উপর তাঁহার উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে। মন্ত্রী সচীপ্রাণ যুদ্ধস্থলে আসিতে সাহসী হইলেন না। তিনি দূরে এক স্থানে বসিয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন।

পাছে গোলা আসিয়া তাহার গাত্রে লাগে সেই ভয়ে একটী বৃহৎ বৃক্ষান্তরালে উপবিষ্ট ছিলেন।

সূর্য্য দেব আকাশে উঠিলেন, মুসলমান সৈন্যগণ বাহির ময়দানে আসা হেতু রৌদ্রের উত্তাপে ক্লিষ্ট হইতে লাগিল হিন্দু সৈন্যগণ আশ্রয়স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মাধ্যে মধ্যে দুই একটী কামান বা বন্দুকের শব্দ করিতে লাগিল, রীতি মত যুদ্ধ তাহাদের আবশ্যক হইল না। প্রাচীর ভঙ্গ করিতে মুসলমানেরা চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই সময়ে এক একবার গোলা আসিয়া তাহাদের মধ্যে পতিত হইতে লাগিল, তাহাতে বহু সৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। হিন্দুদের উৎসাহের সীমা নাই, স্বয়ং রাজা তাহাদিগকে নানারূপে উৎসাহিত করিতেছেন। তাহারা মরণে স্বর্গ যাবে এই আশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মুসলমান সৈন্যগণ প্রথম হইতেই তাচ্ছল্যভাব প্রদর্শন করিতেছিল সামান্য একজন হিন্দুরাজার সঙ্গে আবার যুদ্ধ। স্বয়ং দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁচিলে দেখা যাইত। এই অহঙ্কারেই তাহাদের এই রংপুরের যুদ্ধে পতন হইল হিন্দু সৈনের তেমন সুশিক্ষিত ছিল না, অস্ত্রশস্ত্র ও মুসলমানদের অপেক্ষা হীন কিন্তু রাজার প্রতি ভক্তি তাহাদের অসীম, ভগবানের উপর আত্মনির্ভর বেশী।

দেখিতেদেখিতে বেলা একপ্রহর অতীত হইল, মুসলমানেরা সহরে প্রবেশ করিতে পারিল না। কেবল তাহাদের বারুদ ও গোলা ক্ষয় হইতে লাগিল। আর মধ্যে মধ্যে বিপক্ষপক্ষের গোলার আঘাতে মুসলমান সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। গৌড়েশ্বর দেখিলেন বড় সহজে জয় করিবেন মনে করিয়াছিলেন—তাহা হইবে না, তখন তিনি শচীপাত্রকে ডাকাইলেন ও বিশ্বাসী কয়েক জন সেনাপতি লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। শচীপাত্র বলিলেন "ইহারা অব্যর্থ কৌশলে যুদ্ধ কচ্চে। আমাদের ধারণা ছিল সহজেই প্রাচীর ভেদ হবে এবং হিন্দু সৈন্য পরাজিত হবে। তার পর যে যুবক গতরাত্রিতে হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল, সেও সাহায্য করবে এবং কৌশলে একটী দ্বার খুলে দিবে। সবই এখন নিষ্ফল দেখছি এখন সন্ধির প্রার্থনা করা উচিত, তার পর আগামী কল্য যাহা হয় হবে, বৃথা সৈন্যক্ষয়ে প্রয়োজন নাই।" সকলেরই এই পরামর্শ স্থির হইল তখন শ্বেতবর্ণ পতাকা উড্ডীয়মান হইল, উভয়পক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। রাজা নীলাম্বর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তিনি নিজ সৈন্যগণকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন। তার পর তাহার আদেশে একজন সৈনিক শত্রুপক্ষের কথা শুনিতে প্রাচীরের উপর উঠিল। মুসলমান সৈন্য পক্ষে বলিলেন—আমরা আজ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নই, তোমার রাজাকে সংবাদ দেও। অদ্য আমরা ভয়ানক ক্লান্ত, তাই অদ্য বিশ্রামাভিলাষী। এক দিন সময় আমাদিগকে দিবেন, আমরা আগামী কল্য আমাদের সন্ধীর প্রস্তাব উপস্থিত করব, হিন্দু সৈন্যদিগের যুদ্ধ প্রণালী, সাহস, তেজ দেখিয়া আমাদের গৌড়েশ্বর বড় সন্তুষ্ট হয়েছেন, এমন রাজ্য তিনি নষ্ট করতে চান না। যাহাতে এই রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে আর কোন শত্রু এই রাজ্য আক্রমণ না করে যাহাতে এই রাজ্যে মিত্রতা স্থাপন হয়, যাহাতে রাজা নীলাম্বর গৌড়েশ্বরের বন্ধু হন। ইহাই আমাদের প্রভুর একান্ত ইচ্ছা। তুমি গিয়া এই সব কথা তোমার প্রভুকে বল।" সৈনিক প্রাচীর হইতে নামিয়া সকল কথা রাজা ও সৈন্যদিগকে বলিল, রাজা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যাহা হউক, এক্ষণে তাহার সৈন্যগণ শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত, একদিন অবসরই মঙ্গল। আগামী কল্য যদি সন্ধি হয়, তবে ভাল, নতুবা আবার যুদ্ধ করা যাবে, এইরূপ স্থির করিলেন। হংসেশ্বর রায় বলিলেন—"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু আমার মতে এই সব স্তোক বাক্যে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়, যুদ্ধ ক্ষান্ত দেওয়া উচিত নয়।" রাজা এই পরামর্শ শুনিলেন না, তিনি অদ্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে আদেশ করিলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি-এ।

---

## ব্যবধান।

১

কোথা আছ তুমি
অয়ি মম জীবন সঙ্গিনী
শৈশবের সহচরী সাথী কিশোরের
মূর্তিমতী ভালবাসা নব যৌবনের
শান্তিহীন ত্রাসিত প্রাণের
স্নিগ্ধ শান্তি ছায়া স্বরূপিনী
অয়ি মম প্রাণ প্রণয়িনী !

২

ভুলে কোথা আছ তুমি
প্রণয়ের সজীব প্রতিমা
লুকায়েছ কোথা তুমি
মম রমণী গরিমা।
অই সেই বাপীতট সেই বাতায়ন.
সেই স্নিগ্ধ সুমধুর জোছনা প্লাবন,
সেই ছাদ, সেই স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ
সেই শয্যা, সেই গৃহ শান্তি নিকেতন,
সব আছে, তুমি নাই. তোমার বিহন
করিতেছে হতাশের বিষাদ সৃজন।

৩

সে আমার এসেছিল কদিনের তরে
নন্দন-প্রসূন ফুটেছিল দরিদ্রের ঘরে
এনেছিল ত্রিদিববাসিনী
ভালবাসা, সুখ শান্তি
অমৃত আনন্দ প্রীতি
বরষিতে দারিদ্র কুটিরে।
চোরে নিয়ে গেল হরে সোনার কমল
রেখে গেল ছিন্ন তন্ত্র হৃদয়ের উষ্ণ অশ্রুজল ॥
চোরে নিয়ে গেল হরে সোনার মুরতি
রেখে গেল সে যে তীব্র নিরমম স্মৃতি ॥

৪

একবার এসো ও আমার হৃদয় রতন
একবার এসে দাও দরশন ,——
সাঁঝের তারার মত উজ্জ্বল নয়ন
সুধা মাখা ঢল ঢল কমল আনন
মধুর মধুর হাসি সে যে অমিয় বর্ষণ
মধুর বচন, সে যে পাপিয়ার সঙ্গীত প্লাবন
এসো একবার
আনন্দ আমার
জাগিয়া উঠুক পুনঃ নিস্তেজ পরাণ।
কিন্তু হায়। কোথা তুমি, কোথা আমি
মধ্যে ব্যবধান
অটুট অভেদ্য তাহা রহস্য মহান্।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়।

---

## মাসিক সংবাদ।

**শোক-সংবাদ।**——আমরা অতীব শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, হুগলী সোণাটিকরী গ্রামের স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ভগবানচন্দ্র কর আর ইহসংসারে নাই। বিগত ৪ঠা পৌষ সোমবার রাত্রি ৮টার সময়, তিনি সজ্ঞানে ৺ গঙ্গালাভ করিয়াছেন। ভগবানবাবু বহু প্রবীণ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। দরিদ্রগণকে বিনাব্যয় চিকিৎসা করিতে তিনি কখন কাতর ছিলেন না। কত শত দরিদ্র যে তাঁহার কৃপায় ভীষণ ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য; আমরা তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত ডাক্তার যামিনীমোহন কর এল. এম. এস মহোদয়কে কিরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। ভগবান। ভগবানের পরিজনবর্গকে এই নিদারুণ শোকের শান্তি বিধান করুন।

**আমাদের কথা।**—স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন, তাঁহার হৃদয়োন্মাদকারী বক্তৃতার শক্তি অতুলনীয়! এবার "অন্ধের যষ্টি" নামক তাঁহার একটী বক্তৃতা প্রকাশ হইল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভূবের কবিরত্ন মহাশয় ইহা [illegible] আমরা এই নামে আরও একটী বক্তৃতা পাইয়াছি, তাহার ভাষা স্থানে স্থানে [illegible] সংগ্রহকারের পরিবর্ত্তন বলিয়া বোধ হয়, এই প্রবন্ধ প্রকাশ জন্য আমরা [illegible] কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

# আর্য্য-ধর্ম্মের বিধি-নিষেধ।

যেদিন জীব গর্ভবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধরার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহাকে জাতীয় ও দেশীয় বিধি-নিষেধের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। ধরাধামে এরূপ বিধি-নিষেধ প্রভাব পরিশূন্য দেশ বা জাতি একেবারে নাই, যেখানে জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে রক্তপিণ্ডবৎ সদ্যজাত শিশুদিগের প্রতি-পালকেরা স্ব স্ব দেশীয় ও জাতীয় বিধি-নিষেধ অনুসরণ করতঃ শিশুদিগের জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করে। জগতের ইতিহাস আলো-চনা কর, দেখিবে অতি সুসভ্য সুশিক্ষিত জাতি-দিগের মধ্যে এই বিধি-নিষেধের প্রভাব যেরূপ বর্ত্তমান, অতি অসভ্য, বর্ব্বর, পশুপ্রকৃতি-সম্পন্ন মানবদিগের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিই স্ব স্ব দেশীয় ও জাতীয় বিধি-নিষেধের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। মানব-জাতির কথা ছাড়িয়া একবার অন্ধ, জড়, প্রকৃতি শক্তির দিকে লক্ষ্য কর, সেখানেও দেখিবে বিধি-নিষেধের প্রভাব অক্ষুণ্ণ। ঐ যে [illegible] উহার মূল-আকৃতি ক্ষুদ্রা-দপিক্ষুদ্র বালুকা-কণা ভিন্ন আর কিছুই নহে, অন্ধ, জড, প্রকৃতির শক্তির বিধি-নিষেধ প্রভাবে সেই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বালুকা-কণা পরিবর্ত্তিত হইয়া জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন হীরক-খণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অতএব এই জগত বিধি-নিষেধের অধীন। জগতের বিধি-নিষেধ সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ম। এ বিধি-নিষেধের ব্যতিক্রম ঘটাইবার সামর্থ্য মানবের নাই। যে বিধি-নিষেধের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া শৈশব অতিবাহিত করিয়াছ, যৌবনে স্বাধীন চিন্তা-প্রভাবে যদি সেই বিধি-নিষেধগুলিকে তোমার গন্তব্যপথের অন্তরায় স্বরূপ মনে কর, তাহা হইলে অনায়াসে তাহা পরিত্যাগ করিতে পার। এবং স্বেচ্ছামত বিধি-নিষেধ সংগঠন করিয়া অথবা বৈদেশিক কোন বিধি-নিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া আপন ক্রিয়াশক্তিকে পরিচালিত করিতে পার বটে, কিন্তু একেবারে বিধি-নিষেধ পরিশূন্য হইয়া ক্ষণকালও এ জগতে তিষ্ঠিতে পার না। মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন না দিয়া, প্রকৃত মানব নামের যোগ্য হইয়া, মানব-সমাজে বসবাস করিতে গেলে বিধি-নিষেধের বশবর্ত্তী হইতেই হইবে। হিন্দু-